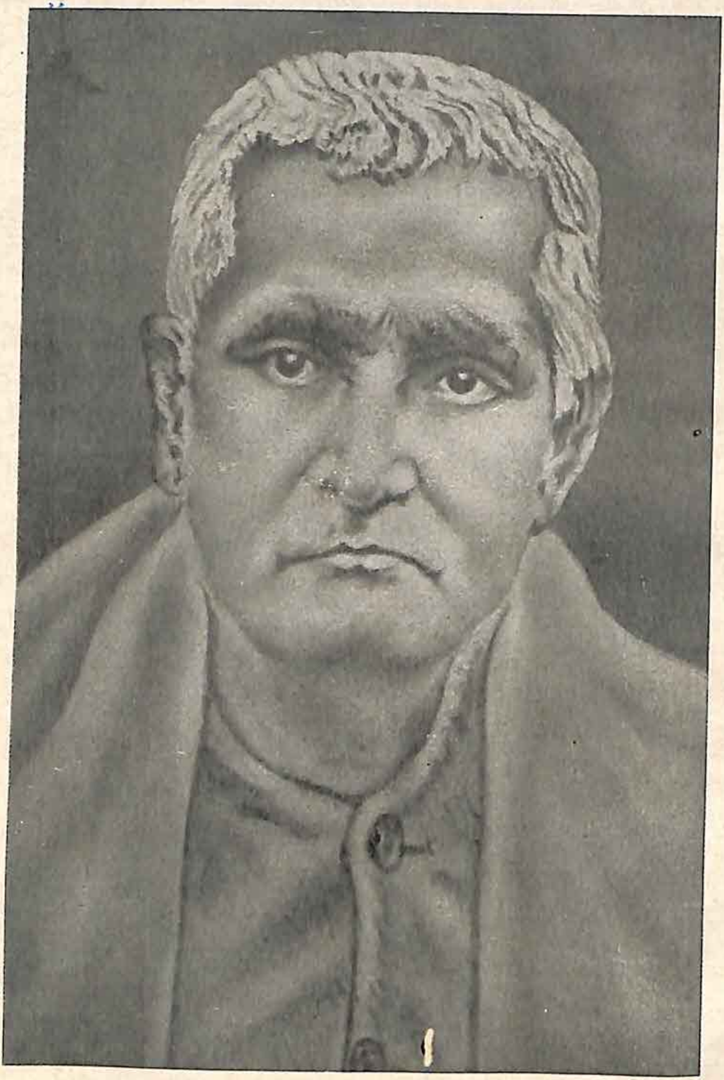
সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	...	৩
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	২৩
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	...	৪৩
হর্মান হেলম্‌হোলৎজ	...	৪৭
আচার্য্য মক্ষমূলর	...	৬০
উমেশচন্দ্র বটব্যাল	...	৭০
রজনীকান্ত গুপ্ত (১)	...	৮৪
রজনীকান্ত গুপ্ত (২)	...	৯০
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৯৭



আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

চরিত-কথা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা 'মরা' 'মরা' বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধারলাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি-না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা, যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষণসেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তী অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পলাশির লড়াইএর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌যত, কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারা প্রকান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক

অনুষ্ঠানে সহৃদয়তার এত অভাব ও মৌখিকতার এত প্রভাব যে, অদ্য যে আমরা তাঁহার স্মৃতির উপাসনার জন্য সমবেত হইয়াছি, এই উপাসনা ব্যাপারটাই একটা ভণ্ডামি নহে, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। আমরা তাঁহার তর্পণোদ্দেশে যে বক্তৃতাময় বারির অঞ্জলি প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার প্রেতপুরুষ যদি অবজ্ঞার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষসমর্থনে বলিবার কথা কি আছে, সহজে খুঁজিয়া পাই না।

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার-অনধিকারের কথা আসে বলিয়া, প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজীর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে ; এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের ও বিদ্যাসাগরের চরিতের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয়ত অসম্ভব ; তথাপি এই সাংবাৎসরিক উপাসনা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশঃ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা। পূজিতের প্রীতি-উৎপাদন, বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে ; পূজক আত্মোন্নতি বিধানের জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠানসাধনে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও আমরা স্বার্থের অনুরোধে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

কিন্তু প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কি-না, সেই ঘোর সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মানবতাকে সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালীত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে তাঁহার স্বজাতি তাঁহার নিকট আপনার যে মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনকাহিনী পাঠে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া তাঁহাকে যে পদে পদে লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে,

ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকামধ্যে সঙ্কলিত আছে। যদি কোন বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি আঁকিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাকে মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিতলেখকগণ প্রচুর-পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী একাধারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে ; তাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায় ; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন ; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। দুই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবলপর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আপনার বলিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলে তুলনায় আত্মগ্লানি আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্য্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজকীয় শাসনে চারিদিকে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে যখন হিন্দু রাজা হিন্দুরাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখন আমাদের জাতীয় অবস্থা যে সমধিক উন্নত ছিল, অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন না ; অন্ততঃ হিন্দুজাতির পুরাবৃত্তের অভাবে এ কথা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্কবিতর্ক চালান যাইতে পারে। কিন্তু গত কয় শত বৎসরে আমাদের দুর্দ্দশার যে একশেষ ঘটিয়াছিল, এবং বর্ত্তমানকালে আমাদের সামাজিক জীবন সঙ্কটাপন্ন মুমূর্ষু অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। এই নবজীবন-সঞ্চারের কয়েকটি বড় বড় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা প্রধান লক্ষণ, আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ। বেহুলার নাচ দেখিয়া স্বর্গের দেবগণ যতদূর তৃপ্তিলাভ করিতেন, আমরা মর্ত্ত্যদেহ ধরিয়াও কোনরূপেই ততটা পারি না। এখন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের হাতে মানবজীবনের উৎকট সমস্যাগুলার আলোচনা কবিতাকারে দেখিতে চাই। দ্বিতীয় একটা লক্ষণ, আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন এবং তৎসহকারে স্বায়ত্তশাসন-লাভের প্রবল প্রয়াস।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা যে উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। একশত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে কলির প্রকোপ সহসা এতদূর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর পরমায়ুঃ একেবারেই পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ধর্ম্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটি একেবারে চিরদিনের মত খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত

হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইতে দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয়সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিতে চাহি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বঙ্কিমের প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু আশা করি, নবীনচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের তুলিকা অক্ষয় হইয়া আমাদের চিত্তবিনোদনে ও সন্তাপ-হরণে নিযুক্ত থাকিবে।* কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক অবস্থাসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

বস্তুতই শতাধিক বর্ষব্যাপী সুশাসনে আমরা নিতান্ত আদুরে ছেলে হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পরিণামও বোধ করি আদুরে ছেলের পরিণামের অপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ নহে। পল্যঙ্কের উপর সুখশয্যাশায়ী শিশুকে যখন আরামের সহিত তুলিযোগে চুমুকে চুমুকে দুগ্ধপান করিতে দেখা যায়, তখন বয়ঃস্থ লোকের মুখ হইতে "আহা মরি শিশুকাল" ইতি কবিতাবাণী সনিঃশ্বাসে নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে এই শিশুকেই আবার কিছুদিন মধ্যে সেই বয়ঃস্থের স্থান গ্রহণ করিয়া, জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত হইতে হয়। (আমাদের স্নেহময়ী গবর্ণমেণ্ট-জননীর অনুগ্রহের মাত্রা ও আমাদের আবদারের মাত্রা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর আমরা সেই আরামের পল্যঙ্ক ও তুলির দুধ সহজে ছাড়িতে চাহিতেছি না এবং আমানের স্বচ্ছন্দতার অণুমাত্র ত্রুটি ঘটিলেই শৈশবসুলভ সানুনাসিক কণ্ঠধ্বনি বাহির করিয়া, জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি।) বাস্তবিকই আমাদের মত সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

আমাদের মেরুদণ্ডের সনাতন কোমলতা হইতেই এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে, আবার সেই অবস্থা হইতেই মেরুদণ্ডের কোমলতা বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা কথায় কথায় আমাদের চরিত্র-সংশোধনের প্রস্তাব

* যখন এই প্রবন্ধ পঠিত হয়, তখন নবীনচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

করি এবং এই চরিত্র-সংশোধন না হইলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এই মর্ম্মে মহতী ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি। চরিত্র-সংশোধন না হইলে যে উন্নতি ঘটিবে না, ইহা সত্য কথা ; কিন্তু চরিত্র-সংশোধন ব্যাপারটাই কি এত সহজ জিনিষ ? যেন ইচ্ছা করিলেই চরিত্রটা আপনা-আপনি শোধিত হইয়া যাইবে ! কিঞ্চলুকা যেন ইচ্ছামাত্রেই আপনাকে কুম্ভীরে পরিণত করিবে ! ডারুইনবাদীরা বলেন, কুম্ভীরেরও পূর্ব্বপুরুষ এককালে কেঁচোর মত ছিল। কিন্তু সেই কুম্ভীরত্বে পরিণতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে কত যুগব্যাপী জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। ইচ্ছামাত্রেই চরিত্র-সংশোধন ঘটে না এবং প্রস্তাবদ্বারাও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হইলে আমাদের ক্ষুদ্রত্বের উপলব্ধি জন্মিয়া যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এইরূপে সেই আত্মগ্লানির কতকটা ওজন মিলিতে পারে।

আমরা যে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হই, এইরূপে তাহার কতকটা সান্ত্বনা মিলিতে পারে বটে ; কিন্তু এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই ; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে ; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই ; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল ; বঙ্গদেশে তাঁহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে

পারে ; আমাদের মত যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেইজন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে মনে দ্বিধা জন্মে। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য-জাতিসুলভ বিবিধগুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকটে নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু পিতাপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদায় বিপত্তি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে ; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে, অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পর-

জীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্ব্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নূতন মসলাসংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহার-কালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরাজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা সহরের অবস্থাটা ঠিক এমন না হইতেও পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষদিন পর্য্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ-দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্ব্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

সম্প্রতি আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন মাননীয় কোন মহাশয় এইরূপ একটা কথা তুলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যগণের সহিত আমাদের সামাজিক কুটুম্বিতাস্থাপন না ঘটিলে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কথাটা লইয়া আমাদের সমাজমধ্যে অনেকটা আন্দোলন চলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য বেশভূষায় ও পাশ্চাত্য আচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই আন্দোলনে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বৈদেশিকের সহিত কুটুম্বিতাস্থাপন ও বিদেশের আচারগ্রহণ-সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিতে গেলে কি ফল ঘটিত, বোধ হয়, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহার খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা অত্যধিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও তিনি মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক্ সেই দর্প।

আচারবিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই-একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল; এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়া আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

পাশ্চাত্যদেশে ফিলান্থ্রপি নামে একটা পদার্থ আছে; তাহার বাঙ্গালা নাম মানবপ্রীতি। এই মানবপ্রীতি কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে

আবদ্ধ নহে; সমস্ত মানবসমাজ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিক্যাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। এই লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগদিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার, কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোকহিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, প্রাচ্য দেশে তাহার তুলনা মিলে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভিতর এমন একটা স্ফূর্ত্তি রহিয়াছে, যেন তাহা আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয় এবং অন্য কোন মূর্ত্তিধারণের সুবিধা না পাইলে, এই মানবপ্রীতির ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। যে স্ফূর্ত্তির বশে ইংরাজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনটাকে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দেয়, এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া, অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া, পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। পরের উপকার যেন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; আপনার নিজত্বের অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক।

বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলান্থ্রপিষ্ট বলা চলে না। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থ-শাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণা-বশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকেই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই, যেমন করিয়াই হউক,

তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্ব্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে ও গৌণসম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্বঘটিত ও সমাজতত্ত্বঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন্ ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব। তাঁহার জীবনচরিত-লেখকেরা যেগুলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই পড়িতে পড়িতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শ্রোতৃবর্গ ভয় পাইবেন না; আমি সেই ফর্দ্দ এক্ষণে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘ ফর্দ্দের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বইটা কার্য্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর-একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।

ইউটিলিটির হিসাবে ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ইউটিলিটির হিসাবটা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সমাজের স্থিতির ও গতির নিয়মগুলা এতই জটিল যে, সেই নিয়মগুলাকে যতই আয়ত্ত করিতে যাওয়া যায় তাহারা ততই যেন হাত হইতে পিছলাইয়া

পড়ে। সমাজতত্ত্ব-সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা যতই অধিক হইতেছে, সমাজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতিসম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। একটা অকর্ম্মণ্য, অলস, কুচরিত্র ব্যক্তির আহার দিয়া প্রাণ বাঁচাইলে আমাদের পরিমিত খাদ্যসমষ্টির পরিমাণ অকারণে হ্রাস করা হয় এবং মনুষ্যজাতির জীবনসংগ্রামকে কিয়ৎপরিমাণে আরও তীব্র করিয়া তোলা হয়, এই হিসাবে দয়াপ্রকাশ গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া আজ-কালকার অনেক সমাজতাত্ত্বিক নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দয়া প্রকাশব্যাপার কতদিকে কত উপায়ে গৌণভাবে ও পরোক্ষভাবে শুভ-ফলের আনয়ন ও উৎপাদন করে, তাহা আমাদের স্থূল হিসাবে ধরা পড়ে না ; কাজেই ইউটিলিটির জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে শূন্য পড়িয়া যায়। রাজশাসন ও সমাজশাসন আর ধর্ম্মের শাসন, লোকাচার ও দেশাচার, নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, বিদ্যার বিস্তার ও জ্ঞানের বিস্তার, সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়া সহস্র গির্জ্জাঘর ও সহস্র কারাগার আর সহস্র বিদ্যালয় ও সহস্র ধর্ম্মাধিকরণ মনুষ্যের জীবনসময়ের উৎকর্ষতার লাঘবসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সমাজতত্ত্ব দুঃখের সহিত বলিতেছে, মনুষ্যের এই যুগযুগান্তরব্যাপী সমবেত চেষ্টার একমাত্র ফল নিষ্ফলতা। মনুষ্যচরিত্রে স্বার্থপরতার মাত্রা কোনরূপে কমাইতে না পারিলে, বোধ করি, এই দ্বন্দ্বের ভীষণতার কোনরূপ লাঘব হইবে না। সন্তানকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া উঠে ; কোনরূপ ক্ষতিলাভ-গণনার বা কর্ত্তব্যনির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের চরিত্র যদি কখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, স্নেহাকৃষ্ট জননীর মত দুঃখক্লেশাতুর মনুষ্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সে আপনা হইতেই বাধ্য হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের আশা করিতে পারা যায়। অনেক হিসাবনিকাশ জমাখরচ বিচারের পর কর্ত্তব্যনির্ণয় একরূপ ব্যাপার ; আর আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকর্ত্তৃক প্রণোদিত ও

তাড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়া আর-এক রকম ব্যাপার। এই শেষোক্ত স্থলে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিটা স্বভাবের সহিত এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, উহাকে স্বভাব হইতে আর পৃথক করিয়া লওয়া চলে না; পৃথক করিতে গেলে সমগ্র স্বভাবটাই ভাঙ্গিয়া যায়। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষে পরের কাজ করে; কেন-না, পরের কাজটা ভাল কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ; উহাতে নিজেরও লাভ আছে, সমাজেরও লাভ আছে। ইহলোকে, এবং হয়ত ইহলোকের পর আর-একটা যে লোক আছে শুনা যায়, সেইখানে, এই কাজের জন্য বিশেষ প্রতিপত্তিলাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায় খাইতে চায়, পিপাসার উত্তেজনায় জলার্থী হয়; শারীর-বিজ্ঞানঘটিত কোন তত্ত্ব তখন তাহার মনে স্থান পায় না; এমন কি, ক্ষুধার ও পিপাসার তাড়নায় এমন খাদ্য ও এমন পানীয় সে উদরস্থ করিয়া ফেলে যে, শারীরবিজ্ঞান তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে; সেইরূপ পরার্থপরতা তখনই স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইবে, যখন মনুষ্য সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের মুখে আপনা হইতে ধাবিত হইবে। তাহার এই কার্য্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে, কি অমঙ্গল হইবে, তাহা চিন্তা করিতে সে সময় পাইবে না। মনুষ্যের ইতিহাসে যদি কখন এইরূপ দিন আইসে, যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপে মনুষ্যকে পরের কাজে প্রেরিত করিবে, তখন হয়ত রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্ম্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং কারাগার ও গির্জ্জাঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্র-শালিকায় একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে। মনুষ্যের ইতিহাসে এমন দিন আসিবে কি-না জানি না; কিন্তু মনুষ্যের এই পরম ধর্ম্মের কল্পনা অন্ততঃ একটা দেশের মানবমস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যে দেশের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের

নায়ক ভগবান্ রামচন্দ্র, এই নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপনার প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নীকে কর্ত্তব্যবোধে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যে দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপ্রচারক ভগবান্ সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখযাতনা হইতে মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণার্থ রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই; যে দেশের উপাস্য মানবদেব শ্রীকৃষ্ণ এই নিষ্কামধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত, সেই দেশে এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত প্রবৃত্তির ঐতিহাসিক উদাহরণও নিতান্ত বিরল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসন্তানগণের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে; কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে আদৌ দেখিতে পাই না, তাহা অসম্ভব নহে। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। (ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য এবং অভিগম্য।)

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও

কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম ; বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব ; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না কিন্তু প্রাচ্যদেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেন ; কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময় ঘেঁষিতে পারিত না। বায়ু-প্রবাহে দ্রুম-সানুমানের মধ্যে দ্রুমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান্ চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি দ্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান্ই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিতলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলেন না। তবে সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্ব এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সমুদ্রতলে সার্ জন্ লরেন্স্* ডুবাইয়া দিয়া দুনিয়ার

* এই নামে একখানা জাহাজ ৭০০ যাত্রিসহ কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার সময়ে বাতাবর্ত্তে পড়িয়া সমুদ্রে মগ্ন হয়।

মালিক কিরূপ করুণাপ্রকাশ ও মঙ্গলসাধন করিলেন, এক নিঃশ্বাসে তিনি তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। বস্তুতই দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি সেইজন্যই ঈশ্বর ও পরকালসম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্ত্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন ; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না। এমন দিন কবে আসিবে, যে দিন মনুষ্যসমাজ সাম্প্রদায়িক কোলাহলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ; যে দিন আপামর-সাধারণ বিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগরের অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যনির্ণয়ে মন দিতে অবকাশ লাভ করিবে।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। সমাজ-সংস্কারের কথাটা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে যদি নিতান্ত আতঙ্ক জন্মে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের নিকট মার্জ্জনার ভিখারী হইতেছি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কথাটা একেবারে না তুলিলেও চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথপ্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্য্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত ; দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্যথা দিত ; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই ; তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়? ইহা তিনি বুঝিতেন না এবং

ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরধুনী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন কাহার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে। বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটীভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন ; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন।

কিন্তু এই সমাজসংস্কার-ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে তিনি পিতামাতার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা-প্রতিপাদনে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই দুইটাই আমাদের পক্ষে চিন্তনীয় বিষয়। সম্প্রতি আমরা নীতিশাস্ত্র হইতে 'মরাল কারেজ' নামক একটা সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি।* কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় স্বার্থবিসর্জ্জন ব্যাপারটা যে কোন দেশের একচেটিয়া নহে, তাহা সদা সর্ব্বদা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের প্রাচীনা ভারতভূমিতেও এই কর্ত্তব্যের জন্য স্বার্থ-বিসর্জ্জনের উদাহরণ ভূরি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় যে, অন্যত্র যেসব ঘটনায় ঢক্কানিনাদ হইয়া থাকে, এ দেশে তাহার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই মরাল কারেজটা এ দেশে নূতন আমদানি এক অপূর্ব্ব জিনিষ। আরও দুঃখের বিষয় যে, একালের শিক্ষার সহিত এই মরাল কারেজের কি একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সংসারের হাইড্রলিক প্রেসের চাপে

* Moral courage.

পড়িয়া, ইহা অনেকটা সঙ্কুচিত ও শীর্ণ হইয়া পড়ে; কিন্তু শিক্ষানবিশ বালকগণের নৈতিক সাহসের আক্রমণটা নিরীহ পিতামাতার উপর দিয়া, নিরীহতর প্রতিবেশীর উপর দিয়া ও নিরীহতম মাষ্টার মহাশয়ের উপর দিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই মরাল কারেজের প্রতি বিশেষ রাজি ছিলেন না। স্বাধীন আত্মাকেও কোন কোন স্থানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে বল্গা লাগাইয়া কোথায় তাহাদিগকে নিয়মিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল, জানি না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্ জীবন্তদেবের তুষ্টির জন্য সময়বিশেষে আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। তাঁহার ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ বঙ্গদেশে তখন ছিল না। কিন্তু মানবজীবনে এমন সময় আসিতে পারে, যখন সেই মুক্তবায়ুমার্গে বিহারপ্রয়াসী স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; ইহা তিনি মানিতেন। সেই শৃঙ্খলকে কপটাচারের আয়স নিগড় মনে করিবার প্রয়োজন নাই। উহা প্রেমের শৃঙ্খল ও ভক্তির শৃঙ্খল,—মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেমের বন্ধন প্রকৃতি আপন হাতে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, যে ভক্তির বন্ধন ব্যক্তিনিহিত ক্ষুদ্র জীবনকে সমাজরূপী বিরাটপুরুষের ঐতিহাসিক জীবনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এই প্রেমের শিকল ও ভক্তির শিকল গলায় পরিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়; "মণিমুক্তার মোহন মালা" ইহার নিকট স্থান পায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজলে আমাদের পাষাণহৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমরা ভণ্ড ব্রহ্মচর্য্যার মলিন পাংশুবিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখমোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের

জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা; কিন্তু ইহাই বিধিলিপি, ইহাই প্রকৃতির নির্ব্বন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল;—কেন-না, ইহা বিধিলিপি।

এই দেশাচারগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীনকালে একদিন জন কয়েক ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া লাভের প্রত্যাশায় এই জঘন্য দেশাচারসমূহের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং জনসমাজ ভয়ে হউক বা নির্ব্বুদ্ধিতায় হউক, সেই সকল ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আজ্‌কাল সমাজশরীরের সহিত জীবশরীরের তুলনা করা এবং সমাজের অন্তর্গত দেশাচারকে জীবশরীরোদ্গত ব্যাধিজনক বিস্ফোটকের সহিত তুলনা করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীববিদ্যার অন্তর্গত আধুনিক নিদানশাস্ত্রে বিস্ফোটকের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাহির হইতে রোগের বীজ শরীর-মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজশরীরের অন্তর্ভূত পুরুষপরম্পরাগত প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে আগত বলিতে পারা যায় না; সমাজশরীরের বয়ঃক্রমানুসারে তাহারা জৈবিক নিয়ম মতেই আপনা হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজশরীরকেও ঠিক জীবশরীরের মত দুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয় এবং সেই আত্মরক্ষার প্রয়াসফলে তাহাতে বিবিধ অঙ্গ, বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ হয়। জীবশরীরের মধ্যে কতকগুলা অবয়বের চিহ্ন দেখা যায়। শারীর-বিজ্ঞানে তাহাদিগকে vestigial organ আখ্যা দেয়। জীবনধারণে ও জীবনরক্ষণে এই ক্ষুদ্র অবয়বগুলার কোনরূপ উপযোগিতা দেখা যায় না;

বরং সময়ে সময়ে তাহারা জীবনের সংহারক হইয়া উঠে। সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের নিরর্থক ও অনাবশ্যক অস্তিত্বরক্ষার জন্য সমগ্র দেহের নিকট হইতে পুষ্টির ভাগ ও শক্তির ভাগ গ্রহণ করিয়া, জীবনের প্রতিকূলতাই সাধন করে। ইহারা জীবনযাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিদ্যার মতে বিস্ফোটকের বা ব্যাধির স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, যখন তাহারা জীবনের পক্ষে আবশ্যক ছিল, যখন তাহারও জীবনের আনুকূল্যসাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীন্তন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের আপনা হইতে বিকাশ হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনসহ তাহাদের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কাজেই তাহাদের অস্তিত্বও বিলোপের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সমাজশরীরে দেশাচারগুলাও কতকটা যেন সেইরূপ। সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল; এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায়, তাহারা অনাবশ্যক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সময়সাপেক্ষ; এবং সেই দিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজশরীরের চিকিৎসক বিস্ফোটকভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্ব্বত্র সুফল নাও হইতে পারে।

আমার যে সকল বন্ধুবর্গের অনুগ্রহবশে আজি আমি বিদ্যাসাগরের চরণোপান্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের অবকাশ পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা প্রচলিত নাই এবং কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার উপকরণ উপযুক্ত-পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা

করিয়া যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই অভাবের ও অসুবিধার বিশেষ ভুক্তভোগী। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের মত মহাশয়ের স্পর্শে যিনি কখন আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, যিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁহার চরিত্রে কোন একটা দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, তৎসমস্ত সাধারণের নিকট ব্যক্ত করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, ব্যক্তিগত হইলেও তাহা বলিতে সাহসী হইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট-বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর। মহাকবির বাক্যে আছে, "যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে।" মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা যে সময়ে বিদ্যাসাগরের কর্ম্মবহুল জীবনের অন্যতম ব্যবসায় ছিল, সেই সময় আমার পিতামহের ক্ষুদ্র কুটীর একদিন বিদ্যাসাগরের পাদস্পর্শে তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছিল। শৈশবকালে সেই গৌরবান্বিত দিবসের প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধে নানা কথা অন্তঃপুরবাসিনীগণের মুখেও শুনিতে পাইতাম। পাঠশালায় প্রবেশলাভের পর বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তকপরম্পরার শুভ্র মলাটের উপর একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পাঠশালা ও লেখাপড়া আর ছাপার বহি ও পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কিরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ কল্পনায় স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের আকৃতি, পরিচ্ছদ এবং কার্য্যাবলী-সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তৎসমুদয় সেই কল্পনার সহিত বিজড়িত করিয়া অন্তঃকরণ একটা বিদ্যাসাগরমূর্ত্তি গড়িয়া ফেলিয়াছিল। বটতলার পুস্তকের বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ পরুষমূর্ত্তি একব্যক্তি আমাদের

পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত। শ্রোতৃগণ মার্জ্জনা করিবেন, সেই লোকটাই যে নিশ্চিত বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে আমাকে উত্তরকালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আমার মনস্তত্ত্ববিৎ বন্ধুগণের উপর এই বিষম সমস্যার মীমাংসার ভার থাকিল। ১২৮৮ সালের ২১শে মাঘ তারিখে আমি কলিকাতা সহরে আসি এবং ২৩শে তারিখে তীর্থযাত্রীর আগ্রহের সহিত পিতৃব্যদেবের সমভিব্যাহারে চিরাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাগর-দর্শন-লালসা তৃপ্ত করিয়া জীবন ধন্য করি। শৈশবকালের কাল্পনিক বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম কি-না, সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই দিবস তাঁহার মুখ হইতে যে কয়েকটি বাক্য শুনিতে পাইয়াছিলাম, আজি পর্য্যন্ত তাহা আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে; আশা করি, সেই উদার প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া, সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যে সকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশলাভ করিয়া হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাঁহারা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। সেই প্রাচ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। আমাদের এই দুর্দ্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবন-সঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না! কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্ত্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারত-ভূমিতে নূতন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সে মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃতজাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বার বৎসর অতীত হইল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্যামাঙ্গিনী জননীর অঙ্কদেশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এতদিন আমরা তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ কোনরূপ আয়োজন আবশ্যক বোধ করি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে এতদিন জাগে নাই, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক। বার বৎসর পরে যদি সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া থাকে, সেই প্রবুদ্ধিসাধনে আমাদের কৃতিত্ব বিচার্য্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কোন তপোলোকে বা সত্যলোকে অবস্থিত হইয়াও মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার দুঃখিনী জননীকে আজও ভুলিতে পারেন নাই;—সেইখানে বসিয়া "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে" বলিয়া কাতরকণ্ঠে গান গাহিতেছেন;—আর মানবের অশ্রুতিগোচর সেই সঙ্গীত সপ্তকোটি কণ্ঠে কলকলনিনাদ উত্থাপিত করিয়া, বঙ্গভূমিকে জাগ্রৎ করিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি আজ যদি জাগিয়া থাকে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই উহা জাগাইয়াছেন,—আমাদের উহাতে কোন কৃতিত্ব নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উপাসনার জন্য আজিকার সভা আহূত হইয়াছে; যাঁহারা এই উপাসনার আয়োজন করিয়াছেন এবং এই উপাসনা-কর্ম্মকে সম্ভবতঃ সাংবাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা, কি কারণে জানি না, আজিকার অনুষ্ঠানের প্রধান ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তিপ্রকাশের অবসর লাভ

করিয়া, আমি যুগপৎ গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি ; কিন্তু যোগ্যতর পাত্রে এই ভার অর্পিত হইলে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বঞ্চিত হইতে হইত না। কেবল যে সময়োচিত বিনয়প্রকাশের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে ; বঙ্কিমচন্দ্র যে বিস্তীর্ণ বঙ্গীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সহবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনুচরগণের পথপ্রদর্শক হইয়া গিয়াছেন, আমিও সেই বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের এক প্রান্তে এক সঙ্কীর্ণ পথ আশ্রয় করিয়া মন্দগতিতে ধীরে ধীরে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছি ; ইহাই আমার জীবনের কাজ ও ইহাই আমার জীবিকা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকা হস্তে করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রের যে যে অংশ প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সেই অংশে আমার "প্রবেশ নিষেধ"। আমি দূর হইতে সেই আলোকের উজ্জ্বল দীপ্তিতে মুগ্ধ হইয়াছি মাত্র; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যবান্ সহচরগণের ও অনুচরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেও আমি অধিকারী নহি। আজিকার আয়োজনের অনুষ্ঠাতাদিগের অনুগ্রহ-জন্য অকপট কৃতজ্ঞতাস্বীকারে আমি বাধ্য আছি ; কিন্তু আমি আশা করি যে, আপনারা তাঁহাদের পাত্রনির্ব্বাচনে বিষয়বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না।

বাঙ্গালীর জীবনের উপর বঙ্কিমচন্দ্র কত দিকে কত উপায়ে প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি ; কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গালার সার্ ওয়াল্‌টার স্কট্ মাত্র। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচয় অতি অল্পবয়সেই ঘটিয়াছিল, সে বয়সে উপন্যাসগ্রন্থের সহিত আমার পরিচয় বড় একটা স্পৃহণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ বাহির হইতেছিল এবং আমি বঙ্গদর্শনের কয়েক সংখ্যা হইতে বিষবৃক্ষের দুই-চারিটা পরিচ্ছেদ আত্মসাৎ করিয়াছিলাম। সেই বয়সে বিষবৃক্ষের সাহিত্যরসের কিরূপ আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক মনে নাই ; তবে এ কথা বেশ মনে আছে যে, পাঠশালায় গিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভূগোল-

বিবরণের ভারতবর্ষের অধ্যায়ে গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুর মসলিপটম মসলিপটম, আর্কট আর্কট, মদুরা মদুরা, টিনিভেলি টিনিভেলি প্রভৃতি অপরূপ সুশ্রাব্য নামাবলীর আবৃত্তির ত্রুটি ঘটিলে, পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বেত্রাঘাত উপহার পাইয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ দাঁড়াইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা ও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন নিতান্তই তাহার সমর্থন ও পোষণ করে নাই। আমার বেশ মনে আছে যে, 'পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে' এই পরিচ্ছেদের সহিতই আমার তাৎকালিক বিষবৃক্ষপাঠ সমাপ্ত হয় এবং ঐ পরিচ্ছেদের শীর্ষস্থিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি মনের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া, কিছুদিনের জন্য একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। কিছুদিনের জন্য মাত্র, কেন-না পরবৎসর আমি পাঠশালার পরীক্ষায় যে পুরস্কার পাইয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, তাহার রাঙা ফিতার বন্ধনের মধ্যে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষ নামক দুইখানি পুস্তক রহিয়াছে। এই সভাস্থলে যাঁহারা পিতার বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবকের গৌরবযুক্ত পদবী গ্রহণ করেন, তাঁহারা শুনিয়া আতঙ্কিত হইবেন যে, পুরস্কারবিতরণে গ্রন্থনির্ব্বাচনের ভার আমার পিতৃদেবের উপর অর্পিত ছিল এবং তিনিই আমার গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুর প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভৌগোলিকতত্ত্বে পারদর্শিতার পুরস্কারস্বরূপ ঐ দুইখানি গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার নবমবর্ষের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পুরস্কারহস্তে বাড়ী আসিয়া রাত্রিটা এক রকমে কাটাইয়াছিলাম; পরদিনে বিষবৃক্ষ ও তার পরদিনে দুর্গেশনন্দিনী টাইটেল-পেজের হেডিং মায় মূল্য পাঁচসিকা হইতে শেষ পর্য্যন্ত একরকমে উদরস্থ করিয়াছিলাম। ঐ দুই গ্রন্থের কোন্ অংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা যদি এখন অকপটে বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনারা আমার কাব্যরসগ্রাহিতার প্রশংসা করিবেন না। বিষবৃক্ষের মধ্যে যেখানে ছেলের পাল "হীরা আয়ি বুড়ী হাঁটে গুড়িগুড়ি" বলিয়া

সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল ও বৃদ্ধা ইষ্টিরসনামক ব্যাধির প্রতিকার-বিষয়ে কেষ্টরসনামক ঔষধের উপযোগিতা-সম্বন্ধে প্রতিবেশিনীর সহিত আলাপ করিতেছিল, সেই স্থানটাই গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকেই দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পাত্র স্থির করিয়াছিলাম, ইহাও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। আশমানির ঘরে বিমলার আকস্মিক প্রবেশের সহিত বিদ্যাদিগ্‌গজ ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মগোপন করিলেন এবং তাঁহার শীর্ষরক্ষিত হাঁড়ি হইতে অড়হরের ডাল বিগলিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মন্দাকিনীর ধারা বহাইল, সেই বিবরণ যখনই পাঠ করিলাম, তখনই বুঝিলাম যে, বাঙ্গালাসাহিত্য অতি উপাদেয় পদার্থ; এই সাহিত্যের সরোবরে বিদ্যাদিগ্‌গজের মত শতদলকমল যখন বিদ্যমান্, তখন গঞ্জাম গঞ্জাম চত্বরপুরের কাঁটাবন ঠেলিয়াও সেই কমলচয়নের চেষ্টা অনুচিত নহে।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রসম্বন্ধে এত লোকে এত কথা কহিয়াছেন যে, আর সে বিষয়ে কোন কথিতব্য আছে কি-না, আমি জানি না। কথিতব্য থাকিলেও আমি কোন কথা বলিতে সাহস করিব না। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত দাবি করিবেন যে, আমি যখন বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধপাঠে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমি সূর্য্যমুখীর ও ভ্রমরের চরিত্র আর-একবার সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, উভয় চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনায় বাধ্য আছি। যদি কেহ এইরূপ দাবি রাখেন, তাঁহার নিকট আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। বাঁকনল আর টেষ্ট টিউব হাতে লইয়া নানাজাতীয় 'কিম্ভূতকিমাকার' দ্রব্যের বিশ্লেষণ আমার ব্যবসায় বটে, কিন্তু মানবচরিত্র বা মানবচরিত্র-বিশ্লেষণে আমার কিছুমাত্র শিক্ষা বা দক্ষতা নাই; কেন-না, নভেল-বর্ণিত মানবচরিত্র বিশ্লেষণে সল্‌ফুউরেটেড হাইড্রোজেনের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই; ঐ মানবচরিত্র নমনীয় নহে, দ্রবণীয় নহে এবং জলে দ্রব করিয়া উত্তাপপ্রয়োগে উহার

ভাস্বরতাপাদনও অসম্ভব। আর আমার কাব্যরসগ্রাহিতার যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতে আপনারাও আমার নিকট সে আশা রাখেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসম্বন্ধে একটা স্থূল কথা আমার বলিবার আছে। সেই কথা সংক্ষেপে বলিয়াই আমি আপনাদিগকে রেহাই দিব।

এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা বলেন, মানবসমাজের সুখ-দুঃখ, রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি ও ভালবাসাবাসি যথাযথরূপে চিত্রিত করাই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য; উহাতে কল্পনার খেলার অবসর নাই। ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। আর-এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, পাপপুণ্যের ফলাফলের তারতম্য দেখাইয়া সমাজের নীতিশিক্ষার ও ধর্ম্মশিক্ষার বিধানই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে এবং সেই উদ্দেশ্য-সাধনে সফলতা দেখিয়াই নবেলের উৎকর্ষ বিচার করিতে হইবে। ইঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে যেমন ভট্টিকাব্য, ইহাদের মতে ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে তেমনি নবেল; কাব্যের ছলনা করিয়া পাঠকগণকে কাঁদানই নবেল-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবসমাজের যথাযথ চিত্র আঁকিতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন; আর নীতি-শাস্ত্র অতি সাধুশাস্ত্র, ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা মনে করিয়া লইতে পারি—নবেলও এক কাব্য এবং সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। কেবল নীতিশাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শনশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টি যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।

সৌন্দর্য্যেরও প্রকারভেদ আছে; গাছপালার ছবি সুন্দর হইতে পারে, গুপ্তকথার হরিদাসও সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানবজীবনের ও জগৎ-সংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রথমশ্রেণীর কবি। গোড়ার কথা দেখাইলেই কবি হয় না; সেটা দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের আর ধর্ম্মতত্ত্ববিদের কাজ; কিন্তু তাহা সুন্দর

করিয়া দেখাইতে পারিলেই কবি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নবেলের মধ্যে সেই রকম গোড়ার কথা দুই-একটা করিয়া দেখান হইয়াছে; এইজন্য কবির আসনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ।

মানবজীবনের একটা গোড়ার কথা এই যে, উহা আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা মাত্র। শুধু মানবজীবনের কথাই বা বলি কেন, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্য-স্থাপনের নামই জীবন। যাঁহারা হার্বার্ট্ স্পেন্সার-প্রদত্ত জীবনের পারিভাষিক সংজ্ঞা জানেন, তাঁহারা আমার কথায় সায় দিবেন। জীবনের উহা অপেক্ষা ব্যাপকতর সংজ্ঞা আমি দেখি নাই। যাহার জীবন আছে, তাহাকে দুই দিকের টানাটানির মধ্যে বাস করিতে হয়। ধবলগিরি পর্ব্বত বহুকাল হইতে বরফের বোঝা মাথায় করিয়া ভারতবর্ষের পুরুষপরম্পরা অবলোকন করিতেছেন; কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র তাঁহার সজীবতায় সন্দেহ করেন। ধবল-গিরি এত মহান্ হইয়াও শীতাতপের ও জলবৃষ্টির আর তুষারবৃষ্টির উৎপাত অকাতরে সহিয়া আসিতেছেন এবং শত স্রোতস্বিনীর সহস্র ধারা তাঁহার কলেবরকে শীর্ণ বিদীর্ণ ও ক্ষীণ করিয়া, তাঁহার অভ্রভেদী মস্তককে সমভূমি করিবার চেষ্টা করিতেছে; সেই আপন্নিবারণের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টাই নাই। কিন্তু সামান্য একটি পিপীলিকা ক্রমাগত আহার সংগ্রহ করিয়া আপনার ক্ষয়শীল দেহের পূরণ করিয়া থাকে এবং যদি কেহ তাহাকে দলিত করে, সে দংশন করিয়া আত্মরক্ষণে সাধ্যমত ত্রুটি করে না। একদিকে বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে টানিতেছে; অন্য দিকে সে ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার জন্য কেবলই চেষ্টা করিতেছে। তাহার কীটজীবন এই চেষ্টার পরম্পরামাত্র। যেদিন চেষ্টার বিরাম, সেই দিন তাহার মৃত্যু। মানুষও সেই পিঁপীড়ার মতই জীবন ব্যাপিয়া আপনাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার জন্য ব্যাপৃত। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে বহিঃপ্রকৃতির আক্রমণনিবারণে সমর্থ

করিয়া মৃত্যুনিবারণের ধারাবাহিক চেষ্টাই তাহার জীবন। সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে, পণ্ডিতলোকে অর্দ্ধত্যাগে বাধ্য হন ; তাই মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া পণ্ডিত-জীব আপনার অর্দ্ধেককে অপত্যরূপে রাখিয়া অপরার্দ্ধকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে, জীবনের কিয়দংশ রক্ষার জন্য এই অপত্যোৎপাদন। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি প্রবৃত্তির একমাত্র উদ্দেশ্য 'যেন তেন প্রকারেণ' জীবনরক্ষা ; জীবনরক্ষার দুইটি উপায়,—আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। পশুর সহিত নরের এই স্থলে সামঞ্জস্য ; কাজেই ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা পাশবপ্রবৃত্তি বলিয়া থাকি।

কিন্তু মানুষের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ অতি দুর্ব্বল জীব ; সবল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর-একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে ; সেই দলের নাম 'সমাজ'। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে, স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশবপ্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থ মানুষ সেই পাশব-প্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। সহজাত সংস্কারের অভাবে অতীতের অভিজ্ঞ-তায় ভর করিতে হয়। এইজন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক, তাহার নাম 'ধর্ম্মবুদ্ধি' ; ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম্ম। ইহা সমাজরক্ষার অনুকূল,—ইহা লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই ত দুই টানাটানির ব্যাপার ; উহার উপর এই সামাজিক জীবন আর-একটা নূতন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্ম-রক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি, তাহা মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে, আর মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি, যাহা মুখ্যতঃ সমাজরক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অনুকূল, গৌণতঃ আত্মরক্ষার অনুকূলমাত্র, তাহা মানুষকে অন্য দিকে প্রেরণ করে। সামাজিক মানুষকে এই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়। এই

সামঞ্জস্যস্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের 'নৈতিকজীবন'। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে, আর ধর্ম্মবুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে চালাইতে চেষ্টা করে। এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। এইখানেই মানুষের গোড়ার গলদ (Original sin); এইখানেই অমঙ্গলের মূল ; সংসার-বিষবৃক্ষের বীজ (Original evil)। মানবজীবনের উৎকট রহস্যে ইহাই গোড়ার কথা। খোদার সঙ্গে সয়তানের চিরন্তন বিবাদের মূল এইখানে। মনুষ্যের হৃদয় সেই জীবনব্যাপী মহাহবের কুরুক্ষেত্র ; ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চারিখানি উপন্যাসে এই গোড়ার কথাটার আলোচনা করিয়াছেন। সেই মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া মানবহৃদয় কিরূপ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া থাকে, তাহা তিনি সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি উচ্চশ্রেণীর কবি।

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী আর কৃষ্ণকান্তের উইল,—এই চারিখানি উপন্যাসের কথা আমি বলিতেছি। এই চারিখানি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। প্রতাপ ও নরেন্দ্র, অমরনাথ ও গোবিন্দলাল, সকলেই কুসুমসায়কের লক্ষ্য হইয়াছিলেন, ধর্ম্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির তীব্রতায় তারতম্যানুসারে কেহ বা জয়লাভ করিয়াছিলেন, কেহ বা পারেন নাই। বীর্য্যবন্ত প্রতাপ সারাজীবন প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর ও নীরব সাধনার বিষয় জগতের লোকে জানিতে পারিয়াছিল। মোহমুগ্ধ অমর-নাথ আপনার পিঠের উপর আকস্মিক পদস্খলনের স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করিয়া, তাঁহার স্বাভাবিক দম্ভের বলে পরবর্ত্তী জীবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথ আপনার আত্মাকে ছিন্ন-ভিন্ন বিদীর্ণ করিয়া অনাথা পিতৃহীনা বালিকার প্রতি দয়াপ্রকাশের ফলভোগ করিয়াছিলেন। আর সর্ব্বাপেক্ষা কৃপাপাত্র গোবিন্দলাল সর্ব্বতোভাবে

আপনার অনধীন ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া, আপনাকে কলঙ্কহ্রদে নিমগ্ন করিয়া, অবশেষে অপমৃত্যুদ্বারা শান্তিলাভে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই চারিটি মনুষ্যের বিভিন্ন দশার চিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমরা কখনও মানবচরিত্রের মহিমা দেখিয়া স্পর্দ্ধিত ও গর্ব্বিত হইতে পারি, কখনও বা জাগতিক শক্তির সম্মুখে মানবের দৌর্ব্বল্য দেখিয়া ভীত হইতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা—এই গোড়ার কথা—অতি সুন্দর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন এবং এইজন্য তিনি উচ্চশ্রেণীর কবি। আজিকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃশ্য হস্ত আমাদের জাতীয় জীবনকে যেরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যতই উচ্চস্থানে অবস্থান করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য মূর্ত্তির পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আজ ব্যগ্র হইব, ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র কত দিক্ হইতে আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার গণনা দুষ্কর। ইংরাজীতে একটা বাক্য চলিত হইয়াছে, যাহার মূলে গ্রীক্ নাই, সে জিনিষ জগতে অচল। বলা বাহুল্য, এখানে জগৎ অর্থে কেবল পাশ্চাত্ত্যদেশ বুঝায়। আমরা যদি ঐ বাক্যকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলি যে, যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিষ বাঙলাদেশে অচল,—তাহা হইলে নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। ইংরাজী গতিবিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে,—মোমেণ্টাম; বাঙলায় উহাকে 'ঝোঁক' শব্দে অনুবাদ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটা জিনিষকে 'ঝোঁক' দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিষ বাঙলাদেশে চলিতেছে। সেই জিনিষগুলা গতি উপার্জ্জন করিবার জন্য যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন, আর উহা চলিতে লাগিল,—তাহার পর আর উহা থামে নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে নবেলের কথাটাই ধরা যাক। বঙ্কিমবাবুর

পূর্ব্বেও অনেকে বাঙলা নবেল লিখিয়াছিলেন; তাহাতে কিসের যেন অভাব ছিল। ইংরাজীনবিশ অনেক লেখক ইংরাজী নবেলের অনুকরণে বাঙলা নবেল লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কি একটা অভাবের জন্য সেগুলি বাঙলা সাহিত্যে লাগে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নবেল লিখিলেন, আর একদিনেই বাঙলায় সাহিত্যের একটা নূতন শাখার সৃষ্টি হইল। স্রোতস্বতীর যে ক্ষীণা ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, এখন উহা নূতন পথ পাইয়া বিপুলকায় গ্রহণ করিয়া শত উপশাখার সৃষ্টি করিয়া দেশ ভাসাইয়া জলপ্লাবন উপস্থিত করিল। সকলেই জানেন যে,এই জলপ্লাবনে সাহিত্যক্ষেত্র ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙলার অধিকাংশ নবেলই অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য; কিন্তু ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দায়ী নহেন। ইহাতে দেশের দারিদ্র্যের ও দুরবস্থারই পরিচয় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের ইহাতে অঙ্গহানি হয় না। এখন হয়ত বাঁধ বাঁধিয়া দেশকে এই প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দিনে সেইরূপ বাঁধ বাঁধিবার কোন উপায় দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্রের পর যাঁহারা নবেল লিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া, সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকেই কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে, আমাদের এতটা আতঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমরা এদেশে মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বেও অনেক মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও কি-যেন-কি একটার অভাব ছিল; তাই তাহারা সাহিত্যসমাজে প্রভুত্ববিস্তার করিতে পারে নাই। বঙ্গদর্শনই প্রথমে ভবিষ্যতের মাসিকপত্রের রচনারীতি ও সঙ্কলনরীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল; তদবধি সেই রীতি মাসিকপত্রের সম্পাদকগণকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মাসিকপত্র দাঁড়াইয়া ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণা পাইয়াই মাসিকপত্র বঙ্গসাহিত্যে চলিতে লাগিল।

নবেলের মত এই মাসিকসাহিত্যও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি। এক দেশের গাছের বীজ আনিয়া অন্য দেশে উহার চাষের চেষ্টা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। আজ ক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ বিদেশের দ্রব্য গ্রহণ করিব না বলিয়া আস্ফালন করিতেছে, কিন্তু বিদেশী জিনিষকে স্বদেশে স্থান দিতে ভারতবর্ষের কোন কালে আপত্তি ছিল না। আলুর বীজ ও পেঁপের বীজ বিদেশ হইতেই এদেশে আসিয়াছিল এবং আফিমের জন্য ও তামাকের জন্য ভারতবাসী বিদেশের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ আছেন। অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিকে আপন ঘরে স্থান দিতে ভারতবাসী কস্মিন্‌কালে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করিতে আমাদের কোন কালেই ঔদার্য্যের অভাব ছিল না। বিদেশের সকল বীজ এদেশের ক্ষেতে ধরে না; কিন্তু কোন-কোনটা বেশ ধরিয়া যায়। কোন কোন বীজ ফলাইবার জন্য চাষের প্রণালীকে ক্ষেতের অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। নবেলের বীজ মাসিকপত্রিকার বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেই আসিয়াছিল;—যাহারা উহার আমদানি করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ফলাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন চাষের ভার গ্রহণ করিলেন, সেই দিন উহা জমিতে লাগিয়া গেল; এখন উহার শস্যসম্পত্তিতে সুজলা সুফলা বঙ্গধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আফিম এবং তামাক,—এ দুই উপাদেয় ফসল এদেশের জমিতে যেমন লাগিয়া গিয়াছে, নবেলের এবং মাসিকপত্রিকার শস্যসম্পৎ কিছুতেই তাহার নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিবে না।

বাঙ্গালায় নবেল সাহিত্যের ও মাসিক-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি তার অপেক্ষাও বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলাসাহিত্যে তাঁহার কোন্ কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য্য

হইয়াছেন, অন্য কেহই সেরূপ হন নাই। বিদেশের ভাষা অবলম্বন করিয়া আমরা যে বড় হইতে পারিব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া বড় হইবার চেষ্টা যে অস্বাভাবিক ও উপহাস্য, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের লোকের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য দেশের ভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন; তিনি বাঙ্গালায় সাময়িকপত্র প্রচার করেন, বাঙ্গালায় বেদান্তশাস্ত্র প্রকাশ করেন; দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইবার জন্য দেশের লোকের অবোধ্য ভাষায় দেশের লোককে সম্বোধনের অদ্ভুত প্রণালী, তাঁহার স্থিরবুদ্ধি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এমন কি, তিনিই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালাভাষার প্রথম শেষ ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী বাঙ্গালীরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই; হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, হিন্দুস্থানের হিন্দুসন্তানের আশ্রয় বা অবলম্বন, হিন্দুসন্তানের জ্ঞাতব্য বা রক্ষিতব্য কিছুই নাই। বর্ব্বর জাতির প্রাচীন সাহিত্যে ক্ষীর-সমুদ্র ও দধিসমুদ্রের কথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই সিদ্ধান্ত করিয়া লর্ড মেকলে এদেশে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা আনয়ন করিলেন। বিদেশের এই নূতন আমদানি শিক্ষাকে এদেশের লোকে সমাদরে গ্রহণ করিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল যে, এই বর্ব্বরের ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা হইবে। ইংরাজীশিক্ষার প্রথম ধাক্কায় আমাদিগকে ঘর হইতে বাহিরে লইয়া পরের দ্বারে ভিক্ষার্থিবেশে স্থাপিত করিয়াছিল; বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে ডাকিয়া আনেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালাভাষাকে সংস্কৃত করিয়া উহাকে সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী করিয়াছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে পুনঃসংস্কৃতি করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী লিখিয়া যশস্বী হইবার অস্বাভাবিক দুরভিলাষের বন্ধন হইতে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিষ বাঙ্গালাদেশে চলে না। রামমোহন রায় বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে বাঙ্গালাসাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই; তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত-ভাষার ও সংস্কৃতসাহিত্যের পুণ্যতোয়ে বাঙ্গালাভাষাকে স্নান করাইয়া, তাহার দীপ্তকলেবর শিক্ষিতসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্ম্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

আমার প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় সেদিন রাগের মাথায় তাঁহার বহু পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত ডিপ্লোমা-খানিকে চোতাকাগজ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। উপস্থিত প্রবন্ধলেখকেরও ঐরূপ একখানি কাগজ আছে; কিন্তু যখন উহার উপর নির্ভর করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিতেছি এবং উহার বলেই আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিতেছি, তখন ঐ কাগজখানির প্রতি ওরূপ অপভাষা প্রয়োগ করিতে চাহি না। এবৎসর অনেকে বিলাতী লবণ খাইব না —এই জেদ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের রক্তবিন্দুর রাসায়নিক বিশ্লেষণে এখনও ঐ দ্রব্যের অস্তিত্ব ধরা পড়িবে। এতদিন ধরিয়া বিলাতী লবণ হজম করিয়া তাহার গুণ গাইব না পণ ধরিয়া বসিলে, নিমকহারামি হইবে। পাশ্চাত্যশিক্ষা হইতে আমরা কোন উপকার পাই নাই, এ কথা পুরাদমে বলিতে পারিব না। পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে কিছু লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের সকলকেই অল্পবিস্তর মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল, ইহা ততোধিক সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেতিহাস

যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই আক্রমণ হইতে নিস্তার পান নাই।

তবে বঙ্কিমের সহিত অন্যের এ বিষয়ে প্রভেদ আছে। নীর বর্জ্জন করিয়া ক্ষীরগ্রহণের ক্ষমতা একা রাজহাঁসেরই আছে। বঙ্কিমচন্দ্ররূপী রাজহংস পাশ্চাত্ত্য-নীর হইতে যে পরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, আমাদের মত দাঁড়কাকের দ্বারা ততটার সম্ভবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে তিনি কেবল ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই; তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও মাতৃমন্দিরে আনন্দ-মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।

বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কি-না, বলিতে পারি না; কিন্তু 'প্রচারের' পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান্ দেখি। তিনি তখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বদেশবাসীকে ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন। 'ভয়াবহ' অভিধান দিয়া পরধর্ম্মকে নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে; ধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌমিক এবং সনাতন অংশ আছে, তাহা সকল ধর্ম্মের সমান; সে অংশটুকুতে কাহারও ভীত হইবার কোন কারণ নাই; কিন্তু ধর্ম্মের আর-একটা অংশ আছে, তাহা দেশভেদে ও কালভেদে মূর্ত্ত্যন্তর গ্রহণ করে। ধর্ম্ম যখন লোকস্থিতির সহায় এবং লোকস্থিতির নিয়ম যখন বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন, তখন ধর্ম্মের এই অংশ দেশকালের অপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। কোন দেশেই মানবসমাজের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। একটা মানবসমাজ পার্শ্ববর্ত্তী মানবসমাজের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে আসিয়া তাহার সমাজব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হয়। কাজেই ধর্ম্মের এই অংশ দেশকালানুরূপ না হইলে, উহা তদ্দেশে ও তৎকালে

লোকস্থিতির অনুকূল হয় না। তত্তদ্দেশে ধর্ম্মের এই অংশের সহিত তত্তদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাচীনের সহিত সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন করিলে, কোন সামাজিক ব্যবস্থাই কোন দেশের লোকস্থিতির অনুকূল হয় না। যখন বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস বিভিন্ন পথে চলিয়াছে, তখন লোকস্থিতির অনুরোধে ধর্ম্মকেও আত্মসমাজের অনুকূলমূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হয়। এইখানেই আত্মধর্ম্ম ও পরধর্ম্মে ভেদ আসিয়া পড়ে। যে ধর্ম্ম এক সমাজে লোকস্থিতির অনুকূল, সে ধর্ম্ম অন্য সমাজে অনুকূল না হইতে পারে। এইখানে এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম্মশব্দের লক্ষ্য কেবল 'রিলিজন্' নহে। আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক; মানুষের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম্মে,—দাঁতনকাঠির ব্যবহার, হইতে ঈশ্বরোপাসনা পর্য্যন্ত—সমস্তই ধর্ম্মের অন্তর্ভূত। এই হিসাবে যাহা বিদেশীর ধর্ম্ম, তাহা ভারতবাসীর ধর্ম্ম হইতেই পারে না। য়ুরোপের প্রাচীন ইতিহাস ও য়ুরোপের আধুনিক সমাজতন্ত্র যখন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারতবর্ষের আধুনিক সমাজতন্ত্রের সহিত এক নহে, তখন য়ুরোপীয়দের ধর্ম্ম আমাদের পক্ষে পরধর্ম্ম। উহাদের খ্রীষ্টানীয় কথা বলিতেছি না, উহাদের আইনকানুন, আহারবিহার, চালচলন, আদবকায়দা সমস্তই আমাদের নিকট পরধর্ম্ম; আমাদের ধর্ম্মও তেমনি উহাদের নিকট পরধর্ম্ম; এবং বিনা বিচারে ও বিনা কারণে একের পক্ষে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ প্রকৃতপক্ষেই ভয়াবহ। সৌভাগ্যক্রমে এই পরধর্ম্ম-বাৎসল্যের মোহ শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার স্বজাতিকে আপন ঘরে ফিরিবার জন্য ডাক দিলেন, তখন আমরা আগ্রহের সহিত সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আজি আমরা যে আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, বিশ বৎসর পূর্ব্বেই সেই প্রত্যাবর্ত্তনের ডাক পড়িয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পথভ্রষ্ট স্বদেশবাসী সেই ডাকে সাড়া দিতে ঔদাসীন্য দেখায় নাই। আজ সেই ডাক আরও উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়াছে এবং তপস্বী

বঙ্কিমচন্দ্র মর্ত্যলোকে তপস্যার সমাধান করিয়া, অদৃশ্য তপোলোক হইতে আমাদিগকে সেই পরিচিত স্বরে আবার ডাকিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কেহ apostle of culture বলিয়া থাকেন। ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমুদায় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য-বিধানকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির অবিরত সামঞ্জস্য-সাধনচেষ্টার নাম 'জীবন' এবং যখন সমুদায় বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য-বিধান না ঘটিলে, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন ধর্ম্মই জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়। "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।" ধর্ম্মই মানবজীবনকে রক্ষা করে, কেবল ব্যক্তির জীবন বা বংশের জীবন কেন, সমাজের জীবনও ধর্ম্মই রক্ষা করে; এবং যদি কেহ ঐহিক জীবনের উপর পারত্রিক জীবনের রক্ষাকেও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বলিতে চাহেন, তাঁহারও সহিত আমি আজ বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রযুক্ত ধর্ম্মের এই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে, উহা culture অপেক্ষা ব্যাপক হইয়া উঠে। এই ধর্ম্মের অন্বেষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আপন ঘরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গীতাশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই ব্যাপক অর্থে ধর্ম্মশব্দ প্রয়োগ করিলে, সার্ব্বভৌমিক ও প্রাদেশিক, উভয় ধর্ম্মই উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে; এবং বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বা প্রাদেশিক যুগধর্ম্মের অন্বেষণের জন্যও আমাদিগকে পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে না। আজ গীতার সুলভ সংস্করণ লোকের পকেটে বিরাজ করিতেছে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরাজীশিক্ষিত লোকের মধ্যে উহা বিরলপ্রচার ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে, বাঙ্গালাদেশে সে জিনিব অচল থাকে না,—তাহা প্রচলিত হয়;

তাই বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন "নবজীবন" ও "প্রচার" আশ্রয় করিয়া বঙ্গবাসীকে তাহার আপন শাস্ত্রের সহিত পরিচিত করিলেন, সেই দিন হইতে সেই শাস্ত্রকথা বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিতসমাজে চলিতে লাগিল। তদবধি উহা আর থামে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মুখে স্বদেশের শাস্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার অনেক পূর্ব্বে বঙ্গজননীর আর-এক সন্তান বিশ্বজগতে পুরাণকবির চতুর্ম্মুখনিঃসৃত এবং ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের শ্রুতিপ্রবিষ্ট বাণীর মধ্যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার পরে বঙ্গজননীর আর-একজন সন্তান ঈশোপনিষদ্‌গ্রন্থের পরিত্যক্ত পাতার মধ্যে সেই ধর্ম্মের সন্ধান পাইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রুতিবাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বকীয় সামর্থ্যের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর যে জ্ঞানান্ধতা অপনোদন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের স্বদেশে জন্মিয়া ধন্য হইয়াছি। এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই যে, ঐ দুই মহাপুরুষের অনুবর্ত্তীরা ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য বিদেশে যাত্রা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন এবং অন্য দেশের অন্য জাতির শাস্ত্র হইতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সার-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপিপাসুর পিপাসা যদি তাঁহাদিগকে পানীয় অন্বেষণে পৃথিবীভ্রমণে বাধ্য করে, তাহাতে দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই। এই বিদেশ-যাত্রীদিগের পরিশ্রমের জন্য আমরা তত দুঃখিত নহি; কিন্তু বিদেশের আকর্ষণে তাঁহারা স্বদেশী সামগ্রীর প্রতি যদি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার জন্য ক্ষোভ করিবার হেতু আছে। যাহাই হউক, ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিদেশপর্য্যটন অনাবশ্যক হইলেও আমরা ঐ অনাবশ্যক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত

হইয়াছিলাম, এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ডাক দিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই আহ্বান শুনিল ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠে ফিরিয়া আসিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না।

গীতাশাস্ত্র ধর্ম্মের কেবল সার্ব্বভৌমিক সনাতন অংশের উপদেশ দিয়া নিরস্ত হন নাই; প্রাদেশিক ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের তত্ত্বও ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কয়েক সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী গীতাশাস্ত্রে যে সহস্রশীর্ষা পুরুষের মুখনিঃসৃত অভয়বাণী শুনিয়া আসিয়াছে, তাঁহার সহস্র অক্ষি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অংশে নিবদ্ধ আছে। অতএব ঐ শাস্ত্রের উক্তির মধ্যে প্রাদেশিক ধর্ম্মের ও যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে না।

যুগধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তিনি ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মহাহবের যুগে কোন্ মূর্ত্তিতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, মহাভারতের মহাসাগর মন্থন করিয়া ভারতবাসীর নিকট লুপ্তপ্রায় সেই মূর্ত্তির উদ্ধারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যত্নপর হইয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য্য আছে। ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভগবানের যে মূর্ত্তিকে পূজার জন্য আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রে সংসপ্তক সেনার সম্মুখীন পার্থসারথির মূর্ত্তি নহে; তাহা বৃন্দাবনবিহারী গোপীজনবল্লভ বংশীবদনের মূর্ত্তি; তাহা নবনীত-চোর উদূখলবদ্ধ বালগোপালের মূর্ত্তি; তাহা বৎসকুলের সহিত কেলিপর যমুনাপুলিনবিহারী গোপসখার মূর্ত্তি;—যে মূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীকরধৃত মোহন-মুরলীর প্রত্যেক রন্ধ্র শ্রীমুখমারুতে পূর্ণ করিয়া, তদ্গত স্বরস্রোতে বিশ্বপ্রকৃতির মর্ম্মস্থলে আনন্দের ধারা সঞ্চার করেন, উহা সেই মূর্ত্তি। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে নাই; ভারতবাসী ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা মাধুর্য্যের উপাসনায় পক্ষপাতিতা দেখাইবে, ইহাতেও বিস্মিত হইব না। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত-

সাগর মন্থন করিয়া যে মূর্ত্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের মূর্ত্তি; তাহা ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপকের মূর্ত্তি—ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন, উহা সেই মূর্ত্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্ররক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি; জীবনসংগ্রামে জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবন রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত্তি; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্ব্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতক্লিষ্ট দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্ত্তি। যিনি বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত করুণাপ্রবাহের একমাত্র উৎস, তিনি যে কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে এই নিষ্করুণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবরক্তে বসুধাকে সিক্ত দেখিতে বাধ্য হন, তাহা তিনিই জানেন; মনুষ্যের শাস্ত্র এখানে মূক; অথবা এই মূর্ত্তিগ্রহণ সেই সনাতনী মায়ার সহিত অভিন্ন,—যাহা হইতে এই বিশ্বজগতের জন্মাদি, যাহা হইতে জীবের জীবন, যাহা হইতে জীবনে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা ঘটিতেছে, যাহা হইতে মানবের সকল দুঃখের নিদান সেই খ্রীষ্টানকথিত পাপপ্রবণতার উৎপত্তি হইয়াছে, অথবা কবির ভাষায় বলিতে পারি,—ইহা সেই আধ-সত্য; জ্ঞানী যখন তাঁহার আত্মার মধ্যে জগৎকারণের সন্ধান পাইবেন, যখন তিনি আপনাকেই এই জগদ্ভ্রান্তির কারণ বলিয়া জানিতে পারিবেন, যখন তাঁহার অপূর্ণ জগৎস্বপ্নে উদ্বোধনে বিলীন হইবে, তখন সেই মহাস্বপ্নভাঙ্গা দিনে যে আধ-সত্য—

সত্যের সমুদ্রমাঝে হয়ে যাবে লীন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আমরা এই যুগধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনের শেষ-ভাগের প্রত্যেক কার্য্যই বোধ করি এই উদ্দেশ্যের অভিমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে আমাদিগের নিকট যুগধর্ম্মের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন

এবং যুগধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে যুগে সম্ভূত হন, তাঁহার মহৈশ্বর্য্য-মণ্ডিত মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্গজননীর প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ভূমি মাতৃভক্তির জাহ্নবীজলে মার্জ্জিত করিয়া, তাহাকে তাঁহার সিংহাসন স্থাপনের উপযোগী করিতে হইবে। তিনি যে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইবেন, তাহা পুণ্যতোয়ে অভিষিক্ত করা আবশ্যক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

আমরা যাঁহার বরণীয় স্মৃতির উপাসনার জন্য আজ এই সভাস্থলে * উপস্থিত হইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের সহিত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করা একান্ত কঠিন। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য পরিষদের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে সেই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তবে পারিভাষিক হিন্দুধর্ম্ম বা পারিভাষিক ব্রাহ্মধর্ম্ম অপেক্ষা যে সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি প্রশস্ততর, সেই ভিত্তির আশ্রয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতি অকুতোভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। আরও আহ্লাদের বিষয় এই যে, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রকোষ্ঠ হইতে সাহিত্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া,—সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া,—দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অন্য দেশে ধর্ম্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা যাহাই হউক,—আমাদের এই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সংজ্ঞা আয়ত ও প্রশস্ত। যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, যাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে, আমাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশক্রমে তাহারই নাম 'ধর্ম্ম'। সাহিত্য তাহার অঙ্গীভূত। ধর্ম্মরূপ সনাতন অশ্বত্থের মূল রহিয়াছে ঊর্দ্ধে—দেবলোকে; ইহার শাখাপ্রশাখা অবাঙ্মুখে প্রসারিত হইয়া মানবসমাজে কর্ম্মরূপ ফুলফলে ও পত্রপল্লবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মানবজীবনের যাতে স্ফূর্ত্তি, ধর্ম্মের তথায় অধিকার; সাহিত্যে মানবজীবনের স্ফূর্ত্তি; অতএব সাহিত্য ধর্ম্মের অধিকারবহির্ভূত নহে। লোক-

* মহর্ষির মৃত্যুর পর সাহিত্যপরিষদকর্ত্তৃক জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে যে শোকসভার অধিবেশন হয়।

স্থিতি ধর্ম্মের অভিপ্রায়—সাহিত্যলোকস্থিতির সহায়—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, মানুষকে মানুষের সহিত সম্বদ্ধ করিয়া, ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত সংহত করিয়া লোকস্থিতির আনুকূল্য করাই সাহিত্যের একমাত্র ব্যবসায়। অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে চতুষ্টয়ী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আমাদের পূর্ব্বপিতামহ মহর্ষিগণের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ও তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভারতসমাজে আদর্শসাহিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ব্যবহার-সম্পাদনার্থ যে কিছু লৌকিকসাহিত্য বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবে, তাহা সেই অপৌরুষের বাণীর স্মৃতি, অনুস্মৃতি ও প্রতিধ্বনি বলিয়া আমরা ভারতবাসী যুগে যুগে গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; পুরাতনী বাগ্বাদিনীর বীণার তন্ত্রীতে তাহাই বিবিধ মূর্চ্ছনায় যুগ ব্যাপিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার করধৃত-পুস্তক-মধ্যে তাহাই মসীলেখে অঙ্কিত ও নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রলয়কালে মহাবরাহের দংষ্ট্রার উপর যখন বসুন্ধরা অবস্থান করেন, ধর্ম্ম তখন মূর্ত্তিমান হইয়া সেই সনাতন সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করেন। এই পুরাতন সমাজতরণী যখন স্বদেশের অজ্ঞানে ও বিদেশের অনাচারে বিপ্লুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকস্থিতি আনুকূল্যের জন্য সেই প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন; সেই পুরাতনী বাণীর বৈদেশিক বিকৃত প্রতিধ্বনিতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

যাহার নাম ধর্ম্ম, তাহাই স্বভাব এবং স্বভাবের নামান্তরই 'স্বাস্থ্য'। স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি, এবং আমার বিবেচনায় আমাদের

বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জাবোধ করি না; আমরা স্বদেশীকে বিদেশীয় ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না। এই সকল অস্বাভাবিক আচরণ আমাদিগকে সর্ব্বত্র অশোভন ও অসমঞ্জস করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি নিজজীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। যাঁহারা তাঁহার জীবনের আখ্যান জানেন, তাঁহারাই বলিবেন, এই অস্বাভাবিকতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি উৎকট ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সে দিন 'সঞ্জীবনী'-পত্রিকায় পড়িতেছিলাম,—'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপ্রচারকালে ইংরেজি বাগ্মিতার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না।' এই একটি আচরণেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার বিরোধিরূপে দেখিতে পাই, অন্য উদাহরণের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহর্ষিকে বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে, তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সমাজমধ্যে যে ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে আন্দোলনে আমাদের শিক্ষিতসমাজ এককালে ক্ষুব্ধ, তরঙ্গিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সেই বর্ষাকালের ঝটিকা-দুর্য্যোগ এখন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তখন যে সকল ভাবের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের ধারাপ্রবাহে যে কলনাদিনী স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্যভূমিকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্যগ্‌ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা

জানেন, স্বাতন্ত্র্যের সহকারে সংযমই ভারতসমাজের প্রধান লক্ষণ। আমরা যাঁহার তিরোভাবে শোকপ্রকাশের জন্য অদ্য এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি, তিনি সেই ভারতবর্ষের নেতা মহর্ষিগণেরই সন্তান ছিলেন, এবং স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমই তাঁহার মহনীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। ভগীরথের ন্যায় শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক তিনি যে অভিনব সাহিত্যের ভাগীরথীকে বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমকেই তাহার প্রধান লক্ষণরূপে দেখিতে পাই। তাঁহার অসামান্য-ক্ষমতাশালী পুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পুত্রগণের সেই কৃতিত্ব পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে' যে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই, সার সত্যের আলোচনায় তাহা সংযমদ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'মানসী'র স্বাতন্ত্র্য 'স্বদেশী সমাজ'এর কল্যাণপ্রদ সংযমে পরিণত হইয়াছে। তিনি একাধারে যে স্বাতন্ত্র্য ও সংযমের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, প্রার্থনা করি, সেই মহাদর্শ বঙ্গীয় সমাজকে ও বঙ্গীয় সাহিত্যকে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করুক্। তিনি যে মনস্বী পুত্রগণে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মরণচিহ্ন আমাদিগকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চিরজীবী হইয়া বঙ্গভারতীর ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করুন।

হর্ম্মান্ হেলম্‌হোলৎজ

চারি মাস মাত্র হইল * হেলম্‌হোলৎজের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন যে, পৃথিবী হইতে একটা দিক্‌পাল অন্তর্হিত হইয়াছে। হেলম্‌হোলৎজের জন্য শোক করিবার অবস্থা আমাদের এখনও হয় নাই। কখনও হইবে কি ?

'জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ'; কিন্তু হেলম্‌হোলৎজের মত লোক ধরাধামে কয়টা জন্মিয়াছে ? হেলম্‌হোলৎজ মরিয়াছেন সত্য, কিন্তু মনুষ্য যতটুকু অমরতার দাওয়া করিতে পারে, তাহা তাঁহার প্রাপ্য।

ছোটখাট পাহাড়-পর্ব্বত যথেষ্ট সংখ্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া ধরাতলের বন্ধুরতা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু গৌরবে ও মহিমায় ধবলগিরি অধিক স্থানে স্পর্দ্ধিত হয় না। হেলম্‌হোলৎজ নরসমাজে এইরূপ একটা ধবলগিরি ছিলেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে যদি অবতারের আবশ্যকতা স্বীকার করা যায় এবং জ্ঞানের বিস্তার যদি ধর্ম্মসংস্থাপনের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে হেলম্‌হোলৎজ নরসমাজে 'অবতীর্ণ' হইয়াছিলেন।

হেলম্‌হোলৎজ জ্ঞানের পরিধি কতদূর প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ বিবৃত করিতে পারি, এমন স্পর্দ্ধা করি না। সৌভাগ্যক্রমে লণ্ডন রয়াল সোসাইটির গত অধিবেশনে স্বয়ং লর্ড কেল্‌বিন এ বিষয়ে আপনার অক্ষমতা স্বীকার করিয়া, সম্প্রতি ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান অন্যান্য প্রাণীকে তজ্জন্য লজ্জার দায়ে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। মহাজনের নাম কীর্ত্তনে যদি কিছু পুণ্য থাকে, কিঞ্চিন্মাত্রায় সেই সুলভ পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়াসে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

---

* ১৮৯৪ অব্দে পঠিত।

জার্ম্মাণির পতসদাম নগরে ১৮২১ সালে হেলম্‌হোলৎজের জন্ম হয়। ১৮৯৪ সালে সেপ্টেম্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভবিষ্যতে যিনি মানবের বিজ্ঞানেতিহাস লিপিবদ্ধ করিবেন, এই তিয়াত্তর বৎসর বিস্মৃত হইলে তাঁহার চলিবে না।

আমাদের দেশের বালকগণের প্রবল বমনোদ্রেক সত্ত্বেও, ইংরাজি ব্যাকরণ, ইংরাজি ভূগোল, ইংরাজি ইতিহাস, কিছুমাত্র দন্তস্ফুট করিবার সম্ভাবনা ব্যতিরেকেও গলাধঃকরণ করিবার সনাতন নিয়ম প্রচলিত আছে। আমনুপ্রচলিত নিয়মচক্রের নেমি ভারতবর্ষেও ক্ষুণ্ণ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে; এমন কি, জগৎচক্রের নিয়মগ্রন্থিও দুই-একটা শিথিল হইবার সম্ভব; কিন্তু আমাদের পাঠশালার মধ্যে এই প্রাচীন নিয়মগুলির রেখামাত্র ব্যভিচারের কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে একটা ভরসা, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরাজিসম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত, ইউরোপেও (গ্রীক-লাতিনের) অধ্যাপনাসম্বন্ধে অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান। সুতরাং আমাদের ক্ষোভের কারণ নাই; যেহেতু, 'মহাজনো যেন গতঃ' ইত্যাদি।

যাহা হউক, সনাতন নিয়মানুসারে হেলম্‌হোলৎজকেও ক্লাসে বসিয়া গ্রীক-লাতিন গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। শুনা যায়, প্রহ্লাদ 'ক' অক্ষরেই কৃষ্ণনাম-স্মরণে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন এবং ষণ্ডামার্কের প্রচণ্ড শাসনও সরস্বতীর নিকট তাঁহার মাথা নোয়াইতে সমর্থ হয় নাই। হেলম্‌হোলৎজের সম্বন্ধে সেরূপ কোনও নিন্দাবাদ প্রচলিত নাই; তবে তিনি যে ক্লাসে বসিয়া ক্লাসিকের মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়া জ্যামিতির আঁক করিতেন, তাহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এই নীতিবিরুদ্ধ অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য কখনও তাঁহাকে মাষ্টারের বেত্রাঘাত লাভ করিতে হইয়াছিল কি-না, জানি না। জানিলে, অন্ততঃ আমরা কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতাম।

পাঠাবস্থায় পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁহার একটু অনুরাগ ও ঝোঁক

ছিল ; এমন কি, জ্যামিতি ও বীজগণিতের অপেক্ষাও তিনি জড় ও জড়ের গুণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ভালবাসিতেন। সাংসারিক অবস্থার অনুরোধে পিতার আদেশে তাঁহাকে ডাক্তারি শিখিতে হয়। "ফ্রেডরিক উইলিয়ম ইনষ্টিটিউটে" ডাক্তারি শিখিয়া সৈনিকবিভাগে কর্ম্ম লইয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করেন। তবে ডাক্তারি ব্যবসায়ে সেই মহার্ঘ জীবনের অপব্যয় হয় নাই। ডাক্তারি হইতে জীববিদ্যা, তাহা হইতে পদার্থবিদ্যা, তাহা হইতে গণিতবিদ্যা, তাহা হইতে মনোবিজ্ঞান ও দর্শন এইরূপে ক্রমে মনুষ্যজাতির জ্ঞান-মহার্ণবের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কি পরাক্রম!

ডাক্তারি ছাড়িয়া তাঁহাকে নানাস্থানে অধ্যাপকতা করিতে হইয়াছিল। প্রথমে সহকারিত্ব, পরে অধ্যাপকতা। তিনি কনিগস্‌বর্গ, হিদেলবর্গ, বন, এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার অধ্যাপনা করিয়া পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭১ সাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন।

আর সম্মানের কথা! রাজগোষ্ঠী, পণ্ডিতসমাজ ও জনসমাজ, দেশী ও বিদেশী যাঁর যতদূর সাধ্য, তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। এরূপ স্থলে সম্মান-প্রদর্শনের অর্থ কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ও ঋণ শোধের চেষ্টা ; কিন্তু এ ঋণ কি শোধিবার?

শরীরবিদ্যাবিষয়ে হেলম্‌হোলৎজ জোহান মূলরের ছাত্র ছিলেন। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য ; কাহাকে দেখিবে বল? আমাদিগকে দৃষ্টিমাত্রেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের স্বদেশে এখন গুরুও নাই, শিষ্যও নাই ; এখানে কাহাকে দেখিব? হায় আমাদেরও অদৃষ্ট! চিরদিনই কি আমাদের এমনি ছিল! এমন দিন কি আসিবে না, যে শিষ্যের মত গুরু ও গুরুর মত শিষ্য এই ভারতবর্ষেও আবার দেখা-যাইবে?

গুরুর প্রবর্ত্তনায় হেলম্‌হোলৎজ দিগ্বিজয়ার্থ অজ্ঞানের তামস রাজ্যে প্রবেশে সাহসী হয়েন। সে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা; তারপর সেই তামস রাজ্যের কতটা তাঁহারই অধ্যবসায়ে আলোকিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কিরূপে জানাইব ?

সেই সময়ে হেলম্‌হোলৎজ টাইফস জ্বরে আক্রান্ত হয়েন। জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যাহা কিঞ্চিৎ সঞ্চয় ছিল, তাহার দ্বারা তিনি একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করেন। আজ কাল শিক্ষার্থীর ঘরে ঘরে অণুবীক্ষণ রহিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগে জার্ম্মাণিতেও তাহা ছিল না। অণুবীক্ষণ আজকাল অনেকের ঘরে দেখা যায় বটে, কিন্তু হেলম্‌হোলৎজ তাহাদের মধ্যে কয় জন ?

যাহা হউক, সেই অণুবীক্ষণ ক্রয়ের পর তাঁহার হাতে যে দুই-একটা প্রকাণ্ড কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

বাক্‌টীরিয়ার নাম আজ লোকের মুখে মুখে;—বিশেষ সম্প্রতি কলিকাতা সহরে ওলাউঠা ও বসন্তের এই প্রকোপকালে। সম্প্রতি কলিকাতার অর্দ্ধেক লোক বসন্তের টীকা লইল; বাকি অর্দ্ধেক হয়ত দুই দিন পরে ওলাউঠার টীকা লইবে। যেরূপ হাওয়ার গতি দেখিতেছি, তাহাতে কিছুদিন পরে কুক্কুর-দংশনেও টীকা লইতে হইবে; ইহা বোধ করি বিধাতার বিধান,—ভবিতব্য। বস্তুতঃ শ্বাপদসমাকুলা অরণ্যানী আর মানুষের ভয়বিধায়িনী নহে; শয্যাতলে লুক্কায়িতা কালভুজঙ্গও আর যমদূতী নহে; এখন স্থূলদৃষ্টির অগোচর কমা-বাসিলাস অথবা দাঁড়ি-ভিব্রিও কখন্ কোন্ অলক্ষিতে দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া অকস্মাৎ অন্তরাত্মাকে তাহার প্রিয়তম আধার হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কাতেই অন্তরাত্মা একরকম পূর্ব্ব হইতেই ওষ্ঠপ্রান্তে অবস্থিত থাকেন। প্রকৃতই আজকাল 'শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তম্'। জীবিতব্য

কিরূপে, তাহা ভাবিবার দরকার নাই; জীবন যে এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য।

জীববিদ্যাঘটিত এই নূতন তত্ত্বের সহিত মহাত্মা পাস্তুরের নাম চির-কালের জন্য গ্রথিত রহিয়াছে; কিন্তু সকলে হয়ত জানেন না যে, এই নূতন মন্ত্রের হেলম্‌হোলৎজই পুরাতন ঋষি।

জৈব পদার্থ কিরূপে পচিয়া যায়, ইহা একটা রসায়নশাস্ত্রের সমস্যা। পচিবার সময় জৈব পদার্থের অঙ্গারভাগ বায়ুস্থিত অম্লজানের সহযোগে ধীরে ধীরে পুড়িয়া যায়, ইহা অবশ্য রাসায়নিকগণের পুরাতন আবিষ্কার। কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র, প্রায় অতীন্দ্রিয় জীবাণু যে এই অবকাশে অপ্রতিহত-প্রভাবে আপনাদের শরীরপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি সাধিত করিয়া লয়, এই গুপ্ত বার্ত্তাটুকু কিছুদিন পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। আজকাল অবশ্য টিণ্ডাল প্রভৃতির প্রসাদে এইরূপ দুই-চারিটা কথার সংবাদ রাখা বড়ই সুকর হইয়াছে; এবং যে জানে না, সে কতকটা ত্রেতাযুগের জীব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ফলে হেলম্‌হোলৎজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নূতন ক্রীত অণুবীক্ষণ-সাহায্যে পচনশীল দ্রব্যে এই জীবাণুর অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। শুধু অস্তিত্বের আবিষ্কার নহে; এই জীবাণুর অবস্থিতিই পচনক্রিয়ার একমাত্র কারণ; যেখানে জীবাণু-প্রবেশের পথ রুদ্ধ, সেখানে জৈব পদার্থ সহস্র বৎসর অম্লজানের স্পর্শে রক্ষিত হইলেও পচিবে না; শর্করায় মাদকত্বের উৎপত্তি ঠিক্ এই পচনক্রিয়ারই অনুরূপ; ইহাতেও জীবাণু-বিশেষের অবস্থিতি আবশ্যক; এ সমুদয়ই হেলম্‌হোলৎজ সপ্রমাণ করেন। একটা আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা ছিল—হয়ত সেই সেই জীবাণুর শরীর হইতে এরূপ কোনও রস বা বিষ নিঃসৃত হয়, যাহা শুদ্ধ রাসায়নিক ক্রিয়াবলে জৈব পদার্থকে বিকৃত করে ও শর্করাকে সুরায় পরিণত করিয়া থাকে। হেলম্‌হোলৎজ শর্করা ও জীবাণুর মাঝে একখানি সূক্ষ্ম পরদা রাখিয়া

দেখাইলেন যে, পরদাখানি নিঃস্থত রসের সঞ্চার রোধ করিতে পারে না, জীবাণুগণেরই সঞ্চার রোধ করে মাত্র। কিন্তু এরূপ স্থলে চিনির মধ্যেও পরিণতি ঘটে না। সিদ্ধান্ত হইল,—এই ব্যাপারটা জৈব প্রক্রিয়া; রাসায়নিক প্রক্রিয়া নহে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলে না জানিতে পারেন; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখও অসম্ভব। পাস্তুরের মহিমান্বিত আবিষ্ক্রিয়া-পরম্পরার ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া হেলম্‌হোলৎজের নাম উল্লেখ না করিলে চলিবে না।

জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়; নির্জীব জড় হইতে কখনও জীব জন্মিতে দেখা যায় নাই; এই তথ্যের আবিষ্কার উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতেই আসিয়াছে। যাঁহারা বানর হইতে মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে মনে আনিতেও একটা নৈতিক মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করিয়া স্তম্ভিত হয়েন তাঁহাদের অনেকে অবলীলাক্রমে নির্জীব জড় পদার্থ হইতে অকস্মাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত শরীর জীবের উদ্ভব স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। স্বেদ, মল, আবর্জ্জনা হইতে বিধাতার মর্‌জিতে বড় বড় কীটের বা পতঙ্গের উৎপত্তি আপনা হইতে হয়, ইহাতে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরও ধ্রুব বিশ্বাস; তবে শুধু আমাদের দেশেই নহে।

শরীরবিদ্যায়, স্নায়ুযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াসম্বন্ধে হেলম্‌হোলৎজ যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা ও উদ্ভাবনশক্তি কিরূপে জটিল সমস্যার তথ্যোদ্ভেদে সমর্থ হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জীবদেহে স্নায়ুসূত্রগুলি টেলিগ্রাফের তারের সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। তাহারা বাহিরের খবর ভিতরে পৌঁছাইয়া দেয় ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনে। সংবাদবহন তাহাদের কাজ। তাড়িতশক্তি

যেমন কয়েকটি সঙ্কেত আশ্রয় করিয়া এক প্রান্তের বার্ত্তা অন্য প্রান্তে উপস্থিত করে, ইহারাও সেইরূপ সঙ্কেতের আশ্রয় করিয়া বাহিরের বার্ত্তা ভিতরে প্রেরণ করে ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনয়ন করে। মস্তিক অর্থাৎ হেড অফিস কতকগুলি সঙ্কেত পাইয়া তাহার অর্থ আবিষ্কার করিতে ব্যাপৃত থাকে এবং অর্থ আবিষ্কারের পর তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করে।

স্নায়ুসূত্রের কার্য্য সংবাদপ্রেরণ; তবে এই সংবাদপ্রেরণে সময় আবশ্যক হয় কি না? তাড়িত প্রবাহযোগে বার্ত্তাপ্রেরণেও কিছু-না-কিছু সময় দরকার; আলোকেরও সুদূরস্থ নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে পৌঁছিতে সময় দরকার হয়। স্নায়ুসূত্রের ভিতরে এই স্রোত কি বেগে প্রবাহিত হয়? হেলম্‌হোলৎজ প্রথমে দেখান, এই স্রোতের বেগ সেকেণ্ডে ষাটি হাত মাত্র; তড়িৎপ্রবাহ বা আলোকতরঙ্গের তুলনায় নগণ্য। অর্থাৎ কি না, একটা ষাটি হাত লম্বা তিমি মাছের লেজে বল্লমের খোঁচা বিঁধিলে মস্তিষ্কে তাহার খবর পৌঁছিতে অন্ততঃ এক সেকেণ্ড সময় লাগিবে; অথবা এক সেকেণ্ড পরে সে বুঝিবে যে, এত বড় একটা প্রাণঘাতক ব্যাপার উপস্থিত। আবার, আঘাতের পরে মস্তিষ্ক হইতে আদেশ আসিয়া তাহার লেজ সরাইয়া লইতে অন্ততঃ আর-এক সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত হইবে।

শুনা যায়, ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের মস্তিষ্ক হইতে কর্ণ দুই ক্রোশ তফাতে অবস্থিত ছিল। হে ত্রৈরাশিজ্ঞ মানব, বল দেখি, কপিরাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক উক্ত রক্ষঃপ্রবীরের কর্ণচ্ছেদন ব্যাপার সংঘটনের কতক্ষণ পরে তিনি টের পান?

বলিতে গেলে, আধুনিক শব্দবিজ্ঞান হেলম্‌হোলৎজেরই গঠিত,— তাঁহারই "হাতে মানুষ-করা" ছেলে। হেলম্‌হোলৎজের পূর্ব্বে শব্দবিজ্ঞান ও সঙ্গীত বিজ্ঞান সম্বন্ধে গোটা কতক মোটা কথা আবিষ্কৃত হইয়াছিল মাত্র। তিনিই সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। কিরূপে একটি বিশুদ্ধ স্বরের

সহকারে তাহার উর্দ্ধতনগ্রামবর্ত্তী স্বরাবলী সমবেত ও জড়িত হইয়া, ঐ মূল স্বরটিকে বিবিধ নাদে ধ্বনিত করে; কখন সুরের সহিত সুরের মিল ঘটিয়া প্রীতি জন্মে, কখন মিলের অভাবে প্রীতির ব্যাঘাত হয়; নরকণ্ঠ-নিঃসৃত বিবিধ স্বরকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কি কি মৌলিক সুর বাহির করা যায়, কিরূপে যন্ত্রোদ্গত কতিপয় মৌলিক সুরকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন নরকণ্ঠাগত স্বরের উৎপাদন করিতে পারা যায় ইত্যাদি নানা কথা এবং এই সকল শব্দব্যাপারের সময়ে শব্দসঞ্চালক বায়ুমধ্যে ও শব্দোৎপাদক কঠিন দ্রব্যে কিরূপ আণবিক গতি সংঘটিত হয়, হেলম্‌হোলৎজের শব্দবিজ্ঞান-সংক্রান্ত মহাগ্রন্থ প্রচারের পূর্ব্বে এ সমুদয়ই আঁধারে ছিল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংগঠনপ্রণালী এবং কিরূপে বায়ুসঞ্চারী ঊর্ম্মিগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন্ অঙ্গে কিরূপে প্রতিহত হইয়া কিরূপ কাণ্ড ঘটাইয়া দেয়—এ সমুদায় কাণ্ডের সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বে ছিল না। স্বরবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞানের সহকারে যে যে মনোবিজ্ঞানঘটিত গভীর সমস্যা আপনা হইতে উপস্থিত হয়, হেলম্‌হোলৎজের পূর্ব্বে কে তাহার মীমাংসার সাহসী হইত?

শব্দবিজ্ঞানের পর দৃষ্টিবিজ্ঞান। হেলম্‌হোলৎজের আবিষ্কৃত দৃষ্টিবিজ্ঞানঘটিত তথ্যগুলির মাহাত্ম্যের উপলব্ধি করাই কঠিন। তাঁহার আবিষ্কৃত চক্ষুরীক্ষণ (ophthalmoscope) যন্ত্রের উল্লেখ বোধ করি অনাবশ্যক। চক্ষুর অভ্যন্তর পরীক্ষার জন্য আজকাল এই যন্ত্র ডাক্তারদের একমাত্র অবলম্বন।

দৃষ্টিসম্বন্ধে অনেক রহস্য, যাহা সর্ব্বদা আমাদের জ্ঞানের ভিতর আইসে না, তাহা হেলম্‌হোলৎজই প্রথমে দেখাইয়া দেন। রেটিনা নামক স্নায়বিক পরদার গঠন কিরূপ,—চোখের পরকলার কোথায় কতটা বক্রতা,—দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠনে কি কি নানাবিধ সাধারণ ও অসাধারণ দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—দূরদৃষ্টির ও নিকটদৃষ্টির সময়ে কিরূপে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন

অংশ ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়,—কিরূপে বিভিন্ন পদার্থের দূরত্বের উপলব্ধি হয়,—কিরূপে দ্রব্যমাত্রকে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, তিনগুণ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ জন্মে,—বর্ণের উজ্জ্বলতায় কিরূপে ছোট জিনিষকে বড় দেখায়,—কিরূপে তিনটিমাত্র মূল বর্ণের বোধ স্বীকার করিয়া লইলে সেই তিনটি মৌলিক অনুভূতিরই বিবিধবিধানে সংমিশ্রণদ্বারা অসংখ্য বিচিত্র বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি বুঝান যাইতে পারে,—কিরূপে ইহারই মধ্যে একটি মৌলিক বোধের অভাব ঘটিলে মানুষে রঙ্‌কাণা হইয়া যায়,—দৃষ্টিগোচর দ্রব্যমাত্রেরই কোন্ অংশটা বস্তুতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, আর কোন্ অংশটাই বা মান গোচর মাত্র অর্থাৎ একটা বস্তুর কতটা আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, আর কতটাই বা মনে মনে কল্পনা দ্বারা গড়িয়া লই,—ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে হেলম্‌হোলৎজ যে সকল রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, সেগুলির নামোল্লেখমাত্র দ্বারা বিবরণ দেওয়াই অসম্ভব।

অতি প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। কিন্তু জ্ঞান কিরূপে বাহির হইতে এই দ্বারপথে প্রবেশ লাভ করে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় এ পর্য্যন্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত ছিল। বাহিরে জড়প্রকৃতিতে নানাবিধ আনাগোনা আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিতেছে; ইন্দ্রিয়গণ সেই সকলের বার্ত্তা কোনও মতে মস্তিষ্কের হেড অফিসে পৌঁছাইয়া দেয় এবং আমাদের অন্তঃকরণ সেই সঙ্কেতগুলি বাছিয়া গোছাইয়া সাজাইয়া নানাবিধ প্রণালীতে নানাবিধ গঠন প্রস্তুত করে; কতক সুন্দরবোধে ও আবশ্যকবোধে গ্রহণ এবং কতক অনাবশ্যক-বোধে ত্যাগ করিয়া জীবনের স্থিতি, গতি, পুষ্টি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধানে নিরত থাকে। বাহিরে কিরূপ আনাগোনা আন্দোলন চলিতেছে, ইহা জড়বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার বিষয়; ইন্দ্রিয়গণ কিরূপে এই সকল আন্দোলনের বার্ত্তা মস্তিষ্কে হাজির করে, ইহা জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার বিষয়; এবং অন্তঃকরণ সেই বার্ত্তাগুলি বা সঙ্কেতগুলিকে কিরূপে

গোছাইয়া ও সাজাইয়া সেই উপাদানসকলে বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করিতে বসে, তাহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। স্থূলতঃ এই তিনটি ছাড়িয়া আর কোনও বিজ্ঞান নাই। পণ্ডিতগণের মধ্যে এক এক ব্যক্তি ইহার একটিমাত্র অথবা একটিরই কোন সঙ্কীর্ণ অংশমাত্র লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। জ্ঞান-সাম্রাজ্যের তিন মহাদেশে একই সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পারেন, হেলম্‌হোলৎজ এইরূপ কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন ; বোধ করি এ বিষয়ে তিনি তাৎকালিক মনুষ্যমধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন।

শ্রুতি ও দৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ; সূক্ষ্মতায় অথবা প্রভাবে অন্য ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সমকক্ষ নহে। প্রধানতঃ শ্রুতি ও দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া আমরা এই বিচিত্র সুন্দর জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছি। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ইহাদের সাহায্য করে মাত্র। এই দুই ইন্দ্রিয়, ইহাদের গঠন, ইহাদের বিষয় ও ইহাদের ক্রিয়া, এ সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা অপর কেহ করে নাই।

জড়জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জগতের এমন কি সম্বন্ধ আছে যে, কতকগুলি জিনিষকে আমরা সুন্দর দেখি, আর কতকগুলিকে কুৎসিত দেখি ? আমাদের এই সৌন্দর্য্যবোধের মূল কি ? এই সৌন্দর্য্যবোধ কোথা হইতে আইসে ? এই গভীর তত্ত্বের মীমাংসার জন্য মানব বহুদিন হইতে লালায়িত। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মীমাংসা একা হেলম্‌হোলৎজ হইতে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, অন্য কোন ব্যক্তি হইতে তাহা হয় নাই। হেলম্‌হোলৎজই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। জড়ের সহিত মনের কি সম্বন্ধ, এই গভীর সমস্যার মীমাংসার জন্য মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। যে পথে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে, হেলম্‌হোলৎজই তাহা দেখাইয়াছেন।

১৮৪৭ সালে ভৌতিক শক্তির অনশ্বরতা-সম্বন্ধে হেলম্‌হোলৎজের বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। তাহার পর পদার্থবিদ্যা রূপান্তর পরিগ্রহ

করিয়াছে। একটা সুকৌশল যন্ত্র বানাইয়া দিলে, উহা বিনাশ্রমে বিনা ব্যয়ে চিরদিন ধরিয়া চলিতে পারিবে ও কাজ দিবে, সে কালের লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এখনও যে এই বিশ্বাসের ধারা অন্তঃসলিল প্রবাহের ন্যায় বহিতেছে না, এমন নহে। জড়ের সৃষ্টি নাই—বিনাশও নাই, এই তত্ত্ব কিছুদিন পূর্ব্বে রসায়নবিজ্ঞানের জন্মদাতা লাবোয়াশিয়ে-কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছিল ; কিন্তু শক্তিরও যে সৃষ্টি নাই, —বিনাশও নাই, এ তত্ত্ব তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, সৎ অসতে পরিণত হয় না, এইরূপ একটা বাক্য দার্শনিকগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে ; কিন্তু ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণ ছিল না এবং এই স্বতঃসিদ্ধ হইতে কি সিদ্ধান্ত হয় বা না-হয়, তাহারও কেহ ধ্রুব নির্দ্দেশে সাহস করিতেন না। শক্তির বহুরূপিতা হেলম্‌হোলৎজের কিছু দিন পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু শক্তির অনশ্বরতাকে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে প্রতিপাদনের কার্য্য হেলম্‌হোলৎজেরই প্রতিভার অপেক্ষায় ছিল।

এক হিসাবে মনুষ্যশরীরকে যন্ত্রহিসাবে দেখা যায়। তবে সে কালে অন্য যন্ত্রের সহিত দেহযন্ত্রের কোনরূপ তুলনা সম্ভবিত না। বাষ্পযন্ত্রে কয়লা পোড়াইতে হয় ; ঘটিকাযন্ত্রে মাঝে মাঝে দম দিতে হয় ; কিন্তু দেহযন্ত্রে জীবনরূপ একটা কি-জানি-কি অতিপ্রাকৃত শক্তি বিনা ব্যয়ে বিনা শ্রমে কার্য্য চালাইতেছে, এইরূপ একটা বিশ্বাস সকলেরই ছিল। হেলম্‌হোলৎজের লিখিত উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পর হইতে কথা উঠিয়াছে যে, জীবন হয়ত একটা কবিজনোচিত কল্পনামাত্র,—একটা আভিধানিক শব্দমাত্র,—কতকগুলি ক্রিয়াসমষ্টির অভিধান মাত্র। কয়লা না পোড়াইলে যেমন বাষ্পযন্ত্র চলে না, কয়লা না পোড়াইলে সেইরূপ দেহযন্ত্রেরও চলিবার সম্ভাবনা নাই এবং এই উভয় কয়লাই আমাদের সেই চিরপরিচিত কৃষ্ণকায় অঙ্গার।

আমাদের সৌরজগৎ আর-একটা প্রকাণ্ডতর যন্ত্র। সূর্য্যমণ্ডল হইতে রাশি রাশি শক্তি বাহির হইয়া তাপরূপে ও আলোকরূপে দিগদিগন্তে আকীর্ণ হইতেছে এবং তাহারই কণিকামাত্র পাইয়া গ্রহে উপগ্রহে নানাবিধ ভৌতিক ক্রিয়া চলিতেছে। এই পৃথিবীতে যে বায়ু বহে, জল পড়ে, মেঘ ডাকে, বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত জন্মে ও মরে, হাসে ও কাঁদে, খেলা করে ও নাচিয়া বেড়ায়, সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমাগত কণিকাপ্রমাণ শক্তিই এই সমুদয়ের কারণ। কিন্তু এই অপরিমেয় শক্তি আসিল কোথা হইতে? হেলম্‌হোলংজ দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডলে এই শক্তির ভাণ্ডার,—অন্যত্র নহে; ইহারও পরিমাণ আছে ও ক্ষয় আছে। কোথা হইতে এই ভাণ্ডার সংগৃহীত হইল এবং এই ব্যয়েরই বা পরিমাণ কি, হেলম্‌হোলংজ তাহারও হিসাব দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই হিসাব সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। সৌরজগৎরূপ মহাযন্ত্র কিরূপে কত দিন হইতে চলিতেছে, তাহা গণিবার উপায় হেলম্‌হোলংজের নিকটেই মানবজাতি শিখিয়াছে।

গণিতশাস্ত্রে হেলম্‌হোলংজ কি করিয়াছেন, কিরূপে বুঝাইব? দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গসাহিত্য; অন্য দেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে, এদেশে তাহা বর্ণনারও উপায় নাই।

মহামতি লর্ড কেল্‌বিনের বিখ্যাত vortex theoryর কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। জগদ্ব্যাপী আকাশে বা ঈথরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্তের নাম জড়পরমাণু। হেলম্‌হোলংজের প্রতিভা এই পরমাণুতত্ত্বের বীজ রোপণ করিয়াছিল। ঘর্ষণক্ষমতা-বর্জ্জিত তরলপদার্থে আবর্ত্তোৎপাদন গণিবার যে প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, বেলাভূমিতে উর্ম্মিরেখার ও বায়ুমধ্যে মেঘের উৎপত্তি হইতে আকাশমধ্যে জড়পরমাণুর উৎপত্তি পর্য্যন্ত বুঝাইতে সেই প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে।

হেলম্‌হোলংজ অনেক নূতন গড়িয়াছেন, আবার অনেক পুরাতন

ভাঙ্গিয়াছেন। ইউক্লিডের সময় হইতে মানবজাতি আজ পর্য্যন্ত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ লইয়া জ্যামিতিবিদ্যা অথবা দেশতত্ত্ব গঠন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। আজকাল সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির মূল ভিত্তি লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। কে বলিল, আমাদের দেশের (অর্থাৎ আকাশের) সীমা নাই? কে বলিল, আমাদের দেশ সর্ব্বত্রই সমাকার? দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে তাহারাও পরস্পর সমান, কে বলিল, ইহা অখণ্ডনীয় স্বতঃসিদ্ধ? মনুষ্যজাতি আবহমান কাল হইতে কতকগুলি বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। মানুষের মতে এগুলি সত্য,—এগুলি স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের সংস্কার যে, ইহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া না ধরিলে যেন জীবনযাত্রা চলিবে না,—যেন জগৎপ্রণালী উল্টাইয়া যাইবে,—যেন জগদ্‌যন্ত্র বিপর্য্যস্ত হইবে। বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট এইরূপ অধিকাংশ সত্যের স্বতঃসিদ্ধতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যাহা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিগত সত্য বলিয়া মানিতেছ, তাহা প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই সুবিধার জন্য মনুষ্যকর্ত্তৃক সৃষ্ট বা কল্পিত,—মানুষেরই হাতগড়া পুত্তলী। কিন্তু জ্যামিতিবিদ্যার মূল সত্যগুলির স্বতঃসিদ্ধতায় সন্দেহ করিতে ইমানুয়েল কাণ্টও সাহসী হয়েন নাই। হেলম্‌হোলৎজ জ্যামিতিস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। তিনি প্রথমে দেখান, মনুষ্যের মনের বাহিরে সত্যও কিছুই নাই,—স্বতঃসিদ্ধও কিছুই নাই। বিষয়টি বড় গুরুতর, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইল।

অধ্যাপক মক্ষমূলর

ভারতবাসীর নিকট অধ্যাপক মক্ষমূলরের নাম যতটা পরিচিত ছিল, বোধ করি আর কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের নাম ততটা পরিচিত ছিল না। তাঁহার অপেক্ষাও কৃতকর্ম্মা প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিদেশে জন্মিয়াছেন এবং এখনও হয়ত বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু ভারতবাসীর সহিত তাঁহাদের তেমন পরিচয় হয় নাই; শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকে তাহাদের নাম শুনিয়াছেন, অনেকে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় মুগ্ধ থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও মক্ষমূলরের নাম শুনিয়াছেন, এমন উদাহরণ বিরল নহে।

মক্ষমূলরের জীবনচরিত আমাদের সাময়িক পত্রাদিতে পুনঃপুনঃ নানারূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে; সেই জীবনচরিত পুনরায় কীর্ত্তনের সম্প্রতি আবশ্যকতা দেখি না।

কিন্তু মক্ষমূলরের পাণ্ডিত্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল এবং আমাদের সহিত তাঁহার এমন একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, যে সূত্রে তিনি আমাদের মধ্যে এতটা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

মক্ষমূলর সংস্কৃতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার জন্যই আমাদের দেশে বিখ্যাত; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি বিবিধ ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্ত্তমান কালের ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তাঁহাকে গণ্য করিলে ভুল হইবে না। সুবিখ্যাত সার উইলিয়াম জোন্স যে দিন সংস্কৃত সাহিত্য নামে একটা অতি প্রাচীন সাহিত্য আছে, এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, সেই দিনটিকেই বর্ত্তমানকালের ভাষাবিজ্ঞানের জন্মদিন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তৎপূর্ব্বে ইউরোপের পণ্ডিতেরা যেন

যাবদীয় মানবকে ইহুদী জাতিবর্ণিত আদি মানব আদমের সন্তান বলিয়া স্থির করিতেন, সেইরূপ সভ্যজাতির কথিত ভাষাসমূহকে ইহুদী জাতির ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য পাশ্চাত্যদেশে আবিষ্কৃত হওয়ার পর সহসা প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, ইহুদী ভাষার সহিত বিবিধ ইউরোপীয় ভাষার কোন সম্পর্ক নাই; এবং ইহুদী জাতির সহিত ইউরোপীয় জাতিসমূহের কোনরূপ নিকট শোণিতসম্পর্কও নাই। বরঞ্চ সংস্কৃত ভাষার সহিত ঐ সকল ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; এবং সংস্কৃতভাষী ভারতবাসীর সহিত পাশ্চাত্য জাতিগণের শোণিতসম্পর্কও রহিয়াছে। মক্ষমূলরের পূর্ব্বেই এই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে এই নূতন ভাষাতত্ত্ব ও এই নূতন জাতিতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর হইতেই তিনি এই নূতন ভাষাতত্ত্ব ও নূতন জাতিতত্ত্বের তথ্যানুসন্ধানে ও সাধারণের সমক্ষে প্রচারে আগ্রহসহকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আর্য্যভাষাসমূহের সম্বন্ধ-নিরূপণে ও আর্য্যজাতিগণের সম্বন্ধনির্ণয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ভাষাগত সম্পর্কের মূলে জাতিগত সম্পর্ক বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইংরাজের ভাষার সহিত আমাদের ভাষার সম্পর্কও আছে; সুতরাং ইংরাজের সহিত আমাদের শোণিতগত সম্পর্কও আছে; আমরা উভয়েই আর্য্যবংশধর, এই মোটা কথাটা আজকাল সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত এমনও আছেন, যাঁহারা ইংরাজদিগকে আর্য্যনাম প্রদানে কুণ্ঠা বোধ করেন এবং বিশুদ্ধ আর্য্যনামটা কেবল আমাদের নিজস্ব মনে করিয়া আনন্দ বোধ করেন। তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আমার ইচ্ছা নাই; তবে আমরা যে আর্য্যবংশধর

সে কথা আমরা বহুশত বৎসর ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; এবং আমরা যে সেই অতি পুরাতন সত্যটা পুনরায় জানিতে পারিয়াছি ও আমাদের আর্য্যত্বের জন্য স্থানে অস্থানে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছি, তজ্জন্য আমরা আর্য্য মক্ষমূলরের নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণী; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রচার মক্ষমূলরের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য এবং ঋগ্বেদসংহিতার মাহাত্ম্য তিনিই পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রচার করেন। ঋগ্বেদ-সংহিতাকে তিনি আর্য্যজাতির প্রাচীনতম ও মানবজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং ঋগ্বেদসংহিতার কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি আর্য্যজাতির ভারতবর্ষ প্রবেশের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের সাহায্যেই তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রাক্‌কালীন পুরাতন আর্য্যসমাজের অবস্থানির্ণয়েও প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এইরূপে মানব-জাতির অতীত ইতিহাসের একটা বিস্মৃত পরিচ্ছেদ তিনি নূতন করিয়া আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তৎকৃত কালনির্ণয় এবং উদ্‌ঘাটিত ইতিহাস হয়ত সকলে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না; জ্ঞানবৃদ্ধির সহকারে এই ইতিহাস হয়ত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিবে; কিন্তু তাহা হইলেও মক্ষমূলর যে অসাধারণ পরিশ্রম, চিন্তাশীলতা ও অধ্যবসায়ের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সযত্নে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

আমাদের মধ্যে অতি বিজ্ঞ সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক-গণের পুনঃপুনঃ মত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিজ্ঞানকে উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের এইখানেই প্রভেদ। বিজ্ঞান দিন দিন আপনাকে সংশোধিত ও উন্নত করিয়া থাকে; কিন্তু অজ্ঞানের মূর্ত্তি চিরকালই একরূপ। তথায় কোনরূপ বিকারের সম্ভাবনা নাই। আলোকেরই নীল, পীত ও হরিৎ এবং

উজ্জ্বল ও তীব্র ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণ আছে ; কিন্তু অন্ধকার চিরদিনই আঁধার ; তাহার অন্য বিশেষণ নাই।

অধ্যাপক মক্ষমূলর কর্ত্তৃক প্রচারিত ঐতিহাসিক তথ্যসকলে ভ্রম বাহির হইতে পারে এবং তৎকৃত বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় কালক্রমে ভ্রান্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে ; কিন্তু এ কথা সকলেরই জানা উচিত, যে ব্যক্তি কাজ করে, তাহারই ভ্রান্তি ঘটে ; যে ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়, তাহার ভ্রান্তির আবিষ্কার বিধাতার অসাধ্য।

মক্ষমূলরের প্রতিভা কেবল ভাষাতত্ত্বেই আবদ্ধ ছিল না ; ভাষাতত্ত্বের পরিধি ছাড়াইয়া অন্যান্য শাখাতেও তিনি যে সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে সময়ে সময়ে তুমুল আন্দোলন ঘটিয়া গিয়াছে। ভাষাগত সম্পর্কের মূলে জাতিগত সম্পর্ক বিদ্যমান ; এই হিসাবে ভাষাবিজ্ঞান অর্থাৎ philology যে মানববিজ্ঞানের বা anthropologyর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু মানবের মধ্যে শোণিতসম্পর্কের নির্ণয় প্রকৃতপক্ষে জীব-তত্ত্বের বিষয়। তোমার সহিত আমার শোণিতগত সম্বন্ধ আছে কি-না, উভয়ের কথিত ভাষা ধরিয়া বিচার করিতে গেলে, অনেক সময়ে এ বিষয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু উভয়ের শরীরগত সাদৃশ্য, উভয়ের গায়ের রঙ, মাথার চুল, হাতের গঠন, চোখের চাহনি প্রভৃতি ধরিয়া বিচার করিতে গেলে, সিদ্ধান্ত অনেকটা নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে মক্ষমূলরপ্রমুখ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল ভাষাগত সাদৃশ্য ধরিয়া বিবিধ মানবজাতির শোণিতসম্পর্ক-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের এই আবদার সহ্য করিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহাদিগকে স্বকীয় গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিতে উপদেশ দিয়া, শরীরতত্ত্বের সাহায্যে মানবগণের জাতিনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সমালোচনায় ভাষাতাত্ত্বিক-

গণের সিদ্ধান্ত বহুস্থলে সংশোধনসাপেক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং কালে আরও সংশোধনের প্রয়োজন হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভষাবিজ্ঞানের মীমাংসা উল্টাইয়া যাইবে, এরূপও বোধ হয় না।

আমাদের বৈদিক শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও তৎসহ গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্যজাতির প্রাচীন শাস্ত্রের তুলনা করিয়া অধ্যাপক মক্ষমূলর একটা অভিনব দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের স্থাপনায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, অতি প্রাচীনকালে পুরাতন আর্য্যজাতি যখন মধ্য এশিয়ায় বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালী ও উপাসনাপ্রণালী ছিল। আর্য্যগণের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হইলে, সেই প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালীই ক্রমশঃ প্রাদেশিক বিকাশ ও পরিবর্ত্তন-সহকারে বিবিধ আর্য্যধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল; কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুজাতির দেবদেবীগণের সহিত প্রাচীন গ্রীক্ ও জার্ম্মাণ জাতির দেবদেবীগণের পুরাতন সম্বন্ধনির্ণয় অসাধ্য নহে; আর্য্যজাতির প্রাচীন দেবতাগণের সম্বন্ধে বিবিধ উপাখ্যান কিরূপে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া বিবিধ জাতির পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশও সম্পূর্ণ অসাধ্য নহে। আর্য্যজাতির দেবতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া মক্ষমূলর বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিবৃত্তনির্ণয়ে প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং বিজ্ঞানের অন্য যে-কোন শাখার আলোচনাতেই তিনি হাত দিতেন; তিনি তাহাতে ভাষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। রঙিন চশমা চোখে দিলে যেমন জগৎসুদ্ধই রঙিন দেখায়, তিনি সেইরূপ ভাষাবিজ্ঞানের রঙিন পর্দ্দার অন্তরাল হইতে জগতের দিকে চাহিতেন। কাজেই অন্যান্য বিজ্ঞানে তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই; তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্বও পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে নির্ব্বিবাদে গৃহীত হয় নাই। ইংরাজগণের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সর, এড্ওয়ার্ড টাইলর,

এণ্ড ল্যাং প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অন্যবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের বিরোধী মতের সহিত মক্ষমূলরের মতের বিসংবাদ প্রায়ই ঘটিত। ধর্ম্মতত্ত্বের ভবিষ্যৎ কি, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু মক্ষমূলরের প্রতিভা কিরূপ সর্ব্বতোমুখী ছিল, তাহা দেখাইবার পক্ষে ইহা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

মনুষ্যের ভাষার সহিত মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমাদের চিন্তাক্রিয়াটাই ভাষাসাপেক্ষ বটে কি-না, তাহা লইয়া বিতণ্ডা চলিতে পারে। অন্ততঃ ভাষার সাহায্য না পাইলে, মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ হইত, তাহা গভীর আলোচনার বিষয় বটে। মক্ষমূলর মনোবিজ্ঞানের এই দুরূহ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে বা করিবে, তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

যাহাই হউক, ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মধ্যে এবং বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক সমাজে মক্ষমূলরের স্থান অতি উচ্চে ছিল,—কত উচ্চে ছিল, তাহার নির্দ্ধারণে সম্প্রতি প্রয়োজন নাই; সম্ভবতঃ সম্প্রতি তাহার নির্দ্ধারণের সময়ও উপস্থিত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় ইতিহাস-প্রণয়নে তাঁহার কৃতিত্বও ভবিষ্যৎ সমালোচনার বিষয়।

প্রাচ্যবিদ্যায় মক্ষমূলরের পাণ্ডিত্য যে অতি উচ্চশ্রেণীর ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা অন্যান্য পণ্ডিতের নাই এবং যাহার গুণে তিনি ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পাইবার অধিকারী ছিলেন।

এই বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের প্রতি ও ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ। তিনি ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে মনের সহিত ভাল বাসিতেন; বলা বাহুল্য যে পণ্ডিতমাত্রেই—প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমাত্রেই—সেরূপ ভালবাসেন না। ভারতবাসীর প্রতি এই

আন্তরিক অনুরাগ তাঁহার নানা কার্য্যে প্রকাশ পাইত। ভারতবর্ষের সাহিত্য লইয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়া অনেক বড় বড় পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছেন ও উৎকট পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু What India can teach us—ভারতবর্ষ ইউরোপকে কি শিক্ষা দিতে পারে, এই বিষয়ের আলোচনার জন্য কাহারও লেখনী এত ব্যাকুল হয় নাই। অধম ভারতবাসীর জীবনচরিত লিখিয়া সময় ব্যয় করা বোধহয় তৎশ্রেণীস্থ আর কোন পণ্ডিত কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন নাই। মক্ষমূলরের সহিত যে সকল আধুনিক কৃতী ভারতসন্তানের পরিচয় ছিল, অথবা পরিচয় না থাকিলেও যাহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, তিনি তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে ও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা ফেলিবার কথা নহে। ভারতবর্ষের হিতচিন্তায় তাঁহার জীবৎকালের অনেকটা অংশের ব্যয় হইয়াছে। ছোট ছোট কাজেও তাঁহার এই আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের কারাবাসকালে স্বপ্রকাশিত ঋগ্বেদসংহিতা তাঁহাকে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া তিনি এই সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কাজটা ছোট, কিন্তু এইরূপ ছোট কাজেই আত্মীয় চেনা যায়; বিশেষতঃ বন্ধুবর্গের আত্মীয়তার সারতা আপন্নিকষ-পাষাণেই ধরা পড়ে। গল্প শোনা যায় যে, মক্ষমূলর ভারতবর্ষের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াও ভারতভূমিতে পদার্পণে সাহসী হন নাই; তাঁহার আশঙ্কা ছিল, মনঃকল্পিত ভারতবর্ষের যে আদর্শ বহুদিন হইতে তাঁহার মনের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, ভারতবর্ষ চোখের সম্মুখে আসিলে, হয়ত তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। এত মিষ্ট কথা আমরা বড় শুনিতে পাই না। ভারতবর্ষের লোকেও তাঁহার অনুরাগ অনুভব না করিত এমন নহে। বিলাতপ্রবাসী ভারতবাসীর অনেকেই মক্ষমূলরের সহিত আলাপ করিয়া আসা একটা কর্ত্তব্যমধ্যে বিবেচনা করিতেন; এই আলাপসূত্রে অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক

তরুণবয়স্ক ছাত্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শরণাপন্ন হইত। একবার শুনিয়াছিলাম, কলিকাতার কোন ধনিসন্তান পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অধ্যাপক-বিদায়স্বরূপে মক্ষমূলরকে এক জোড়া শাল উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এদেশে অনেক পণ্ডিতলোকে তাঁহাদের গ্রন্থের জন্য মক্ষমূলের প্রশংসাপত্র না পাইলে যেন তৃপ্তিবোধ করিতেন না। এদেশের অনেকের সহিতই তাঁহার চিঠিপত্র চলিত। ফলকথা, মক্ষমূলর আমাদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন; আমরা সেই বন্ধু হারাইয়াছি। পণ্ডিতপ্রসূ পাশ্চাত্যভূমিতে আরও কত বড় বড় পণ্ডিত জন্মিবেন। কিন্তু আর-একজন মক্ষমূলরকে আমরা কবে পাইব, কে বলিতে পারে?

শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ ছুরিকার সাহায্যে মনুষ্যের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার কোথায় কি আছে, সন্ধান করিয়া দেখেন; এবং সেই অনুসন্ধানে কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু সেই শবদেহের প্রতি তাঁহাদের যে বিশেষ একটা অনুরাগ জন্মে, তাহা বলা যায় না। আপনার কাজটা সারিয়া ফেলিয়াই তাঁহারা বিবিধ 'ডিস্ইনফেক্টাণ্ট্' প্রয়োগে আপনার শরীরের অশুদ্ধি, ছুরিকার অশুদ্ধি ও টেবিলের অশুদ্ধি তাড়াতাড়ি শোধনের জন্য ব্যস্ত হয়েন। দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু-জাতির প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকের কার্য্যকে কতকটা এইরূপ শবব্যবচ্ছেদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা এই মৃতজাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া, তাহা হইতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া, যথেষ্ট আনন্দ বা কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাঁহাদের পক্ষে কতটা প্রীতিকর হয়, তাহা বলিতে পারি না। আচার্য্য মক্ষমূলর কিন্তু ইহাকে ঠিক্ শবদেহ বলিয়া ভাবিতেন না। অন্ততঃ এই দেহের ধমনীগুলির মধ্যে এককালে রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হইত এবং ইহার

হৃৎপিণ্ড এককালে প্রাণের শক্তিযোগে স্পন্দিত হইত, ইহা তিনি বুঝিতেন ; এবং বাক্যের দ্বারা ও কার্য্যের দ্বারা তাঁহার এই মনোভাবের পরিচয় দিতেন। সুতরাং আমরা সেই স্বর্গগত আচার্য্যের নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের জন্মাবধি যাঁহারা ইহার সহিত সংস্পৃষ্ট আছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, সাহিত্যপরিষৎ স্থাপনের সময় উপদেশ যাজ্ঞা করিয়া মক্ষমূলরকে পত্র লেখা হইয়াছিল। মক্ষমূলর সেই পত্রের উত্তরে নবীন পরিষৎকে কয়েকটি ছোটখাট উপদেশ দিয়াছিলেন। একটা উপদেশ এইরূপ ;—বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক গ্রামের ও প্রত্যেক নদ নদী বিল খাল প্রভৃতির নাম সংগ্রহ করিয়া সেই সেই নামের উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা পরিষদের একটা কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে, কাজটা অতি ছোট ; এবং আমাদের পরিষৎ এ পর্য্যন্ত এত ছোট কাজে হস্তার্পণ করিয়া আপনার মহত্ত্বকে সঙ্কুচিত করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু পরিষদের জানা উচিত ছিল যে, ছোট বীজ হইতে বড় গাছ হয় এবং ছোট গাছের মাহাত্ম্য যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বড় কাজের সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস-লেখক যদি কেহ না থাকিত, তাহা হইলেও বর্ত্তমান ইংলণ্ডের গ্রামগুলির ও নগরগুলির নামতত্ত্বের আলোচনা করিয়া, সেই দেশে রোমের প্রভুত্বের কথা আবিষ্কৃত হইতে পারিত। সেইরূপ এই ছোট কাজে বাঙ্গালাদেশের বিস্মৃত অতীত ইতিহাসের কোন্ অংশ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে বা না-পারে, তাহা আমরা কিরূপে বলিব ? মক্ষমূলর স্বয়ং ছোট কাজকে অবজ্ঞা করিতেন না। কোথায় দেখিয়াছিলাম মনে হইতেছে না, মক্ষমূলর বিভিন্ন ভাষায় বিড়ালের নামের ইতিবৃত্ত অতি গম্ভীরভাবে আলোচনা করিতে-ছেন। প্রাচীন গ্রীসের ও প্রাচীন ইউরোপের প্রাচীনতম সাহিত্যে নাকি বিড়ালের কোন উল্লেখ নাই ! আমাদের সংস্কৃত প্রাচীনতম সাহিত্যেও

অনেক জন্তুর নাম আছে, বিড়ালের নাকি নাম নাই। বৈদূর্য্যনামক রত্ন, ইংরাজিতে যাহাকে cat's eye বলে, উহাকে বিড়ালশব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বৈদূর্য্য রত্নেরও নাকি অতি প্রাচীন সাহিত্যে নাম নাই। কাজেই অনুমান হইতে পারে যে, প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে এবং আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা যে সকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, সেই সকল দেশে, বিড়াল ছিল না। তার বহুদিন পরে কোন সময়ে আলুর মত ও তামাকের মত কোন্ অনার্য্য বিদেশ হইতে বিড়াল আসিয়া আর্যদেশমধ্যে, আর্য্যগৃহমধ্যে ও আর্য্যসাহিত্যমধ্যে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে। সেই বিদেশী বিড়ালজাতির স্বর্গাদপি গরীয়সী আদি মাতৃভূমি কোন্ দেশ? সম্ভবতঃ উহা মিশরদেশ; মিশরদেশে অতি প্রাচীন-কালে বিড়াল-দেবতা পূজা পাইতেন এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন মিশরদেশে ব্যাঘ্রজাতীয় কোন আরণ্যজন্তু গ্রাম্যতাপাদিত হইয়া বিড়ালরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে কালক্রমে মিশর হইতে বিড়ালের আধিপত্য অন্যান্য স্থলে বিস্তৃত হয়। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবতত্ত্ববিদেরা ভাষাতত্ত্বের নিকট আর-একটা ঋণগ্রহণ করিবেন। মক্ষমূলরের অনুমান সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা বিচার করিবার এই স্থান নহে; আমি কেবল একটা দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতে চাহি যে, বড় লোকে ছোট কাজকে অবজ্ঞা করেন না; তাঁহাদের যত্নে ছোট বীজ হইতে বড় গাছ উৎপাদিত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মকালে ভারতবাসীর হিতৈষী জার্ম্মাণ-দেশোদ্ভব আচার্য্য মক্ষমূলর নবীন পরিষৎকে ক্ষুদ্রকার্য্যে অবজ্ঞা না করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি সেই পরলোকগত মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্ষুদ্র কার্য্যের মাহাত্ম্য বুঝিয়া চলিতে পারি, তাহা হইলে সেই মহাত্মার উপদেশ ও তাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রকাশার্থ আহূত অদ্যকার এই সভা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

আমার যখন পঠদ্দশা, তখন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারী উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম ছাত্রসমাজে অপরিচিত ছিল না ; কিন্তু তিনি তখন বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে বোধহয় অপরিচিত ছিলেন। "সাহিত্য" পত্রে "বৈদিক কালে গোহত্যা"-বিষয়ক যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়, বোধহয় তাহাই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় প্রাচীন ইতিহাসঘটিত গবেষণাপূর্ণ যে সকল প্রবন্ধ সর্ব্বদা বাহির হয়, সাধারণ পাঠকের অন্তঃকরণে তাহা কি রকম একটা ভীতির সঞ্চার করে ; বোধ করি, সেই ভীতির বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তখন সেই বৈদিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে সাহস পাই নাই। "সাধনা" পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা তাঁহার লেখনী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, আমি তাঁহার রচনায় আকৃষ্ট হই এবং তখনই বুঝিতে পারি, বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে একজন মহারথের আবির্ভাব হইয়াছে। তদবধি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে তাঁহার যত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, প্রায় সকলই আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি এবং পড়িয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি ; অথচ, এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ঐতিহাসিক গবেষণায় পরিপূর্ণ।

ইহাও স্বীকার করিতে দোষ দেখি না যে, "সাহিত্য" পত্রের মলাটের উপর উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম মুদ্রিত দেখিলেই মনে একটা হর্ষ উপস্থিত হইত। আশা হইত যে, এমন একটা কিছু তাঁহার রচনার মধ্যে দেখিতে পাইব, যাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। কখনই সে আশা হইতে আমায় বঞ্চিত হইতে হয় নাই।

কিন্তু তখন জানিতাম না যে, এত শীঘ্র এই আনন্দের জনয়িতা

বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইবেন এবং যে আকাঙ্ক্ষার সহিত মাসের পর মাস উমেশচন্দ্রের নাম মাসিক পত্রের মলাটে অঙ্কিত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহা শীঘ্র চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার স্মৃতির প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের কৃতজ্ঞতার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও কখন মনে করি নাই।

বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে নাই; এবং তিনি সাহিত্যের যে অংশের প্রধানতঃ আলোচনা করিতেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে আমার অধিকার-বহির্ভূত। এই অবস্থায় তাঁহার জীবন বা কর্ম্মসম্বন্ধে সমালোচনার আমি কোনক্রমেই যোগ্য নহি। তথাপি যখন "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলেন এবং তজ্জন্য আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন এই অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতে আমি দ্বিধাবোধ করি নাই। দূর হইতে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি যে অত্যধিক অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকাশের অবসর লাভ করিয়া সেই লোভের সংবরণ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্রের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। উমেশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার ভূমিকা মাত্র লিখিয়া গিয়াছেন। সেই অসম্পূর্ণ ভূমিকা হইতে ও তাঁহার পুত্রগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনের স্থূল ঘটনাকয়টির উল্লেখ করিতেছি।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুলের অন্তর্গত রামনগর গ্রাম উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্মস্থান। ১২৫৯ সালের ভাদ্রমাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩০৫ সালের ১লা শ্রাবণ তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। ছচল্লিশ বৎসর

পূর্ণ না হইতেই এই কৃতী বঙ্গসন্তানের অকালমরণ কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল ও অন্যান্য বঙ্গসন্তানের স্মৃতি জাগাইয়া দিবে।

খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামও অন্যান্য কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনের সহিত সম্পর্কসূত্রে সাহিত্যসমাজে অপরিচিত নহে। এই গ্রামের অন্তর্গত অন্যতম পল্লী রাধানগর রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। রামমোহন রায়ের ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থানীয় সমাজের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় দলের নেতা ছিলেন এবং এই সম্পর্কে রামমোহন রায়ের সময়েও উভয় দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

রামমোহন রায়ের সমকালবর্ত্তী রামকানাই বটব্যাল উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধপিতামহ। রামকানাইএর পিতা পিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন; রামকানাই আপন পরিবারমধ্যে স্বকল্পিত যন্ত্রসহকারে অভিনব পদ্ধতিতে শক্তিপূজা প্রচলন করিয়া যান। তাহা এখনও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। উমেশচন্দ্র সেই শক্তি উপাসনার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতে প্রচুর আনন্দ অনুভব করিতেন। উমেশচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল; মাতার নাম প্রসন্নকুমারী দেবী।

শ্রীপ্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারি-প্রতিষ্ঠিত রাধানগর ইংরাজী স্কুল হইতে ১৮৬৮ অব্দে উমেশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসেন; ১৮৭২ অব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে বি.এ. উপাধি লাভ করেন; ১৯৭৪ অব্দে সংস্কৃতশাস্ত্রে এম্.এ. এবং পর বৎসর বি.এল্. উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। অনন্তর ১৮৭৬ অব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়ট পদক পুরস্কার পান। পাঠদ্দশার অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

উমেশচন্দ্র ১৮৭৭ অব্দে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত হয়েন; কয়েক স্থানে ঐ কার্য্যের পর দশ বৎসর পরে ষ্ট্যাটুটারী সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিভিলিয়ানি লাভ করেন;

শেষে বিভিন্ন জেলায় প্রশংসার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটি কার্য্য সম্পাদন করেন। গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে বগুড়ায় অবস্থানকালে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। চিকিৎসায় বা স্থান পরিবর্ত্তনে কোন উপকার হইল না। ১লা শ্রাবণ তারিখে কলিকাতার বাটীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজকীয় কার্য্যে তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন; নম্রতা, রসজ্ঞতা, গর্ব্বাভাব ইত্যাদি গুণে সকলের প্রিয় ছিলেন এবং সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যসাধনে সর্ব্বদা উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র বর্ত্তমান লেখককর্ত্তৃক যথোচিত বর্ণিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

গার্হস্থ্যজীবনে বা রাজকীয় কর্ম্মসম্পর্কে তিনি বৃহৎ সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন; সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বৃহত্তর সমাজের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এই সমাজেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে, তিনি এই বৃহত্তর সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া যাইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার রচনা অপূর্ব্ব সামগ্রী ছিল। এই দুর্ভাগ্য দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় সমগ্র প্রদেশটা যে সেনাকর্ত্তৃক অধিকৃত, সেই সেনাভুক্ত বীরপুরুষগণের বীরত্বের আস্ফলন যথেষ্ট আছে; কিন্তু তাঁহাদের শরীরে মেরুদণ্ডের ও অস্থিকঙ্কালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর প্রমাণাভাব। রামায়ণের আমলে ও হোমারের আমলে বীরপুরুষেরা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বাগযুদ্ধটাকে একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া জানিতেন না; তবে বাহুযুদ্ধটাকে একবার আরম্ভ হইলে, তাহার ফল শত্রুর পক্ষে বড় বিষম হইত। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রের বীরেরা যে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন, তাহার তীক্ষ্ণতা কখন অনুভবের বিষয় হয় না এবং তাঁহারা যে অস্ত্রের আস্ফালন করেন, তাহা কাহারও পৃষ্ঠে কখন কাটিয়া বসে না। এক শ্রেণীর লেখকের

অত্যাচারে মনে হয়, কি অশুভক্ষণেই এদেশে 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'উদভ্রান্ত প্রেমের' প্রকাশ হইয়াছিল। আরও এক শ্রেণীর লেখক নিতান্ত পুরাতন জীর্ণ সত্যকে জীর্ণতর বেশভূষায় কথঞ্চিৎ সজ্জিত ও আবৃত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন; তাহার প্রতিও কোনরূপ অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গভূমি স্বয়ং যে ব্রীহিশস্য বর্ষে বর্ষে উৎপাদন করেন, শুনিতে পাই, তাহা, একান্ত নাইট্রোজেনবর্জ্জিত; আর বঙ্গের বাগ্‌দেবতা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তাহা "ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ"; বঙ্গদেশে কাঠিন্যধর্ম্মবিশিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন, তাহা সুধীগণের আলোচ্য।

উমেশচন্দ্র বটব্যালে বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। উচ্ছ্বাসের হাওয়া ও বাক্যের কুয়াসা কাটাইয়া উন্মুক্ত আলোকে ও কঠিন মৃত্তিকায় দুই দণ্ড দাঁড়াইবার অবসর দিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। তাঁহার উদ্যত অস্ত্রে কেবল ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষমতা ছিল না,—তাহাতে ধার ছিল; যে বাহুতে তিনি সেই অস্ত্রধারণ করিতেন, তাহাতে অস্থি ও পেশী বর্ত্তমান ছিল; কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি জন্মাইতেন না; তিনি প্রায়ই নূতন কথা বলিতেন ও পুরাতন কথাকে নূতন ভাষায় বলিতেন। নূতন সামগ্রীর আস্বাদনে আমাদের রসনা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত হইত; নূতন নূতন তথ্যের আভাস পাইয়া আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বহির্মুখে আসিত ও তন্দ্রাত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিত। এদেশের লেখকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসা নহে এবং এদেশের পাঠকের পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে।

উমেশচন্দ্র প্রধানতঃ স্বদেশের পুরাতন ইতিহাস উদ্ধারেই ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি স্বদেশের ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টা যেন একটু জাগিয়া উঠিয়াছে বোধ হইতেছে। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। আমাদের বিশ্ব-

বিদ্যালয় এতদিন ধরিয়া আমাদিগকে যে বিদ্যা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে দেশে ইতিহাস জানিবার যে আকাঙ্ক্ষা বিশেষ উদ্দীপিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, এইরূপ একটা বিলাপধ্বনি সচরাচর শুনা যায়; কিন্তু আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের কৃতবিদ্যেরাও যে ইতিহাসের গৌরব বুঝিয়াছেন, তাহাও, প্রমাণসাপেক্ষ। পরন্তু নব্যসম্প্রদায়ের এ বিষয়ে আচরণ অনেক সময়ে স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনাজনক। পাশ্চাত্য হিসাবে স্বদেশানুরাগ যাহাকে বলে, তাহা বোধহয় প্রাচীনকালেও আমাদের ছিল না এবং একালের শিক্ষাও তাহা হয়ত জন্মাইতে পারে নাই। মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে, স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্ব্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্পশিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতি-স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতীয় অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।

আধুনিক কৃতবিদ্যগণের মধ্যে যে দুই-চারিজন সুধী পুরুষ আপনার জাতিকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহাদের অন্যতম। আমাদের শিক্ষিত সমাজে তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। সত্য কথা উমেশচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ও ক্ষমতানুরূপ কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পারেন নাই, সে আমাদের দুর্ভাগ্য। এক একবার মনে হয়, যদি তিনি রাজকার্য্য জীবিকার উপায়স্বরূপ গ্রহণ না করিতেন, তাহা

হইলে বোধহয়, আরও অধিক কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সেও বুঝি মনের ভ্রম। কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদিগকে পরাধীন বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই, যাঁহাদের শক্তির বা অর্থ সামার্থ্যের বা অবকাশেরও অভাব নাই, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয়জন উমেশচন্দ্রের মত দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের জন্য অনুরাগ দেখাইতেছেন?

আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবেন, এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষায় বা আলোচনায় কোন লাভ নাই, তাঁহাদের কথা ধরিলাম না। যাঁহারা প্রাচীনকালের জন্য কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তাঁহাদের পরিতাপও স্বদেশানুরাগের দৃঢ়তার অভাব প্রকাশ করে মাত্র। এই অবস্থায় যিনি অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও দেশের অতীত স্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র উদ্যম দেখাইয়াছেন, তিনিই সার্থকজন্মা।

উমেশচন্দ্র এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর সমালোচনা আমার সাধ্য নহে; তিনি কালস্রোতে নীয়মান যে দুই-একটি চিহ্ন মাত্র অবলম্বন করিয়া অতিদূরস্থ বিস্মৃতপ্রায় অতীত দেশের চিত্রাঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার নির্ণয়ে আমি সমর্থ নহি। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলী জনমাজে তেমন সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহাও বোধ হয় না; তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যে সকলেই আস্থা স্থাপন করিবেন, তাহাও মনে করি না। অল্প প্রমাণ আশ্রয়ে, অধিকাংশ স্থলে কল্পনার সাহায্যে, যে ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়, তাহার যাথার্থ্যে সন্দেহ চিরকালই থাকিবে।

অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, উমেশচন্দ্রের বৈদিক প্রবন্ধসমূহ আমার নিকট অয়স্কান্তের কাজ করিত। একটা অনিবার্য্য মোহের আবেগে আমি সেই রচনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইতাম। তিনি পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করিতেন; কিন্তু কেবল বৈদেশিক মতের অনুসরণ করিয়া যাইতেন না; স্বাধীনভাবে

নূতন পথে চলিতে চাহিতেন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহাকে যে পথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। তাঁহার এক একটি প্রবন্ধ, বৈদিক কালের আর্য্য-সমাজের এক একটি পট মানস চক্ষুর নিকট উজ্জল আলোকে ধরিয়া দিত। সেই পট যে সর্ব্বত্র প্রকৃত তথ্যের অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমিও বিশ্বাস করিতাম না; কিন্তু সেই পটের অভিনবত্ব,—তাহার স্পষ্টতা,—তাহার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম। কল্পনার তূলিকা যে স্থানে অস্থানে বিবিধ বর্ণের বিন্যাস করিয়া তাহাকে মূর্ত্তি প্রদান করিত, তাহা বুঝিতাম। অতিরঞ্জনই হয়ত তেমন ঔজ্জ্বল্যের হেতু, ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে। তথাপি সেই পট এক একখানা যখন দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইত, তখন মনের মধ্যে সুখস্বপ্নের স্মৃতির স্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিয়া যাইত। ইহা অন্যান্য ইউরোপীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত ভারতবর্ষের অতীত সমাজের চিত্র হইতে কত বিভিন্ন! হয়ত, ইহা কল্পনাকৃত অতিরঞ্জনে বিকৃত ও অসত্য,—হয়ত আত্যন্তিক স্বজাতিপ্রিয়তা হইতে উদ্ভূত হওয়ায় ও আত্যন্তিক স্বজাতিপ্রিয়তার উৎপাদক বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার অনধিকারী। কিন্তু ইহার মূল্য নির্দ্ধারণ অন্যরূপে করিতে হইবে। ইহা যে অস্পষ্ট স্মৃতি জাগাইয়া দিত,—যে আকাঙ্ক্ষার,—যে অতৃপ্তির—উদ্দীপনা করিত, তদ্দ্বারা ইহার মূল্যের পরিমাণ করিতে হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তির উদ্বোধনই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের অলস, জড় ও সুপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহকে প্রবোধিত করিতে এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তিরই এখন প্রয়োজন। কর্ম্মসম্পাদনে আমাদের এখন শক্তি নাই,—সত্যাবিষ্কারে আমাদের ক্ষমতা নাই। এখন কর্ম্মের প্রতি,—সত্যের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন আবশ্যক। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্যম জন্মিবে, এই উদ্যম কালে ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষার ভাব ও অতৃপ্তির ভাব উমেশচন্দ্রের রচনার প্রত্যেক

ছত্রে প্রকাশ পাইত। তিনি একটা পিপাসার উত্তেজনায় পানীয় আহরণে উদ্যত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে পারিতাম। শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রাণের চেষ্টায় যেন জলের অন্বেষণ করিতেন; এবং সময়ে সময়ে মরীচিকাদর্শনেও যেন তৎপ্রতি ধাবিত হইতেন। অন্ধকূপস্থিত জীব নূতন জ্যোতির দেখা পাইয়া যেন তাহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইত। এইজন্য উমেশচন্দ্রের বৈদিক রচনা আমার নিকটে এত ভাল লাগিত। বাঙ্গালায় আরও কতিপয় মনস্বী ব্যক্তি ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, অনেকেই বৈদেশিকের পদাঙ্ক অনুসরণ ও বৈদেশিকেরই অনুবৃত্তিতে নিরস্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বৈদেশিক প্রণালীক্রমে নূতন সত্যাবিষ্কারেও সমর্থ হইয়াছেন। উমেশচন্দ্রের সম্পাদিত কর্ম্মের অপেক্ষা তাঁহাদের সম্পাদিত কর্ম্ম এক হিসাবে অধিক মূল্যবান্। কিন্তু উমেশচন্দ্রে যে চিত্তপ্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি দেখিয়াছি, যে অনুরাগের, পিপাসার উত্তেজনা দেখিয়াছি, তাহা অন্যত্র দেখিয়াছি, বোধ হয় না। কোথাও দেখি নাই বলিলে হয়ত ভুল হয়। অক্ষয়চন্দ্র দত্তে এই অনুরাগ ও পিপাসা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বিধাতার নিগ্রহ তাঁহার সেই পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে দেয় নাই। বিধাতার নিগ্রহে উমেশচন্দ্রেরও সেই পিপাসার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তির অবসর ঘটিয়া উঠে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র এক কালে বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস রচনার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ তখনও সংগৃহীত হয় নাই; এখনও সংগৃহীত হইতে অনেক বিলম্ব। তিনি বঙ্গের ঐতিহাসিকদিগকে পথপ্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা তাঁহার আন্তরিক স্বদেশানুরাগ হইতে প্রসূত। উমেশচন্দ্রেরও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা ছিল। কোন বন্ধুকে তিনি পত্রদ্বারায় ইহা জানাইয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি উপাদানও

সংগ্রহ করিতেছিলেন। উপাদানসংগ্রহ অনেকেরই সাধ্য; কিন্তু এদেশে সেই সাধ্যসাধনেও সকলে পরাঙ্মুখ। উপাদান একত্র করিয়া তাহাকে যথাবিধানে সজ্জিত ও যথাস্থানে বিন্যস্ত করা সকলের সাধ্য নহে। সংগৃহীত উপাদানের মূল্যনির্দ্ধারণ,—তাহার অর্থের আবিষ্কার,—পুরাতন জিনিষকে নূতন চোখে দেখা,—এ সকলই দুরূহ ব্যাপার। উমেশচন্দ্রে এ শক্তি প্রচুর-পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ শক্তির কার্য্যে বিনিয়োগ ঘটিল না। দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে থাকিয়াই লয় পায়। আমাদের জাতীয় দারিদ্র্য কি চিরদিনই এইরূপ ফলোৎপাদনের প্রতিহর্ত্তা থাকিবে?

উমেশচন্দ্রের দার্শনিক মত তাঁহার সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যত্র তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনামধ্যে তাঁহার দার্শনিক মতের বিশদ উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্য-মতানুবর্ত্তী দ্বৈতবাদী ছিলেন; প্রকৃতি ও পুরুষ, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে এই দুই স্বতন্ত্র অনির্ব্বচনীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। ইংরেজী দর্শনে যাহাকে noumenon বলে বা যাহাকে substance বলে, প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যমতে সেইরূপ noumenon, এবং বহির্জগতে ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে অবস্থিত substance; কোন অজ্ঞেয় কারণে প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে বা সম্বন্ধস্থাপনে এই প্রতীয়মান বিশ্বজগতের অর্থাৎ phenomenon-সমষ্টির উৎপত্তি। এই সম্বন্ধ-স্থাপনেই বিশ্বজগতের উৎপত্তি, সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই সৃষ্টিব্যাপারকে তিনি "দার্শনিক সৃষ্টি" আখ্যা দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা সাংখ্যদর্শনকে 'এভলুশনিষ্ট' বা অভিব্যক্তিবাদী বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই অভিব্যক্তির তাৎপর্য্য ঠিক বুঝিয়াছেন কি-না, বলিতে পারি না। ইংরাজী দর্শনে যে 'এভলুশন' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে জড়জগতের অভিব্যক্তি বুঝায়, তাহাতে ব্যবহারিক প্রতীয়মান,

জগতের বা 'ফেনোমেনাল' জগতের ব্যবহারিক অভিব্যক্তি বুঝায়। সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তি বা দার্শনিক পারমার্থিক অভিব্যক্তি ঐ ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রপ্রকৃতিক; এই কথাটা বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় যেমন স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমন অন্য কোথাও হইয়াছে কি-না, জানি না; অন্ততঃ আমার জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কোথাও দেখি নাই। ভবিষ্যতের দর্শন-ব্যাখ্যাতৃগণ যদি এই পার্থক্যটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে, হিন্দুজাতির দর্শনশাস্ত্র অনেক অপব্যাখ্যা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

উমেশচন্দ্রের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাপাঠে যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি; কিন্তু তাঁহার দার্শনিক দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই। পুরুষের বাহিরে বহির্জগতের অন্তস্তলে প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একটা অনুমান বা 'হাইপথেসিস্' বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও জাগতিক রহস্য ও দার্শনিক সৃষ্টি বুঝা যাইতে পারে। সে বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। পুরুষ অর্থে ফলতঃ যদি আত্মা ধরা যায়, তাহা হইলে, আমার মত অন্যান্য মানবেরও আত্মা আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে উমেশচন্দ্র গণ্য করিতেন। এ কথাটাও ঠিক্ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমার আত্মা আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অপরের আত্মা আমার নিকট অনুমান-গম্য ও কল্পিত পদার্থ। জড়জগৎ যেরূপ আমার অনুমানলব্ধ কল্পিত পদার্থ, জড়জগতের বিচরণশীল জড়শরীরধারী জীবগণের অজড় আত্মাও আমার নিকট সেইরূপ অনুমানলব্ধ কল্পিত পদার্থ; ইহার অধিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে আসে না। বৈদান্তিকেরা সমগ্র বিশ্বকে একমাত্র "অহম্" পদার্থে পরিণত করিয়াছেন; এবং সেই "অহম্"কেই ব্রহ্ম

উপাধি দিয়া বিশ্বের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতার স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। সাংখ্যমতে যেমন অনির্দ্দেশ্য কারণে প্রকৃতি ও পুরুষের, জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সম্মিলনে জ্ঞানের উৎপত্তি, অর্থাৎ বিশ্বের দার্শনিক দৃষ্টি, বেদান্তমতেও সেইরূপ "অহম্" বা ব্রহ্ম-নামধেয় পদার্থ হইতে কোনও অনির্দ্দেশ্য কারণে বা অবিদ্যাযোগে বিশ্বের উৎপত্তি। উভয়ত্রই একটা অনির্দ্দেশ্য কারণ বর্ত্তমান আছে। জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সম্মিলন কিরূপে ঘটিল, বা "অহম্"-এর কিরূপে বিকার ঘটিয়া বিশ্বজগতে পরিণতি হইল, তাহার প্রণালী নির্দ্দেশ করিতে গেলেই এই অনির্দ্দেশ্য হেতুর অবতারণা আসিয়া পড়ে। প্রচলিত ঈশ্বরবাদ সগুণ অথচ বচনাতীত; অনুভবগম্য অথচ অনির্দ্দেশ্য; ঈশ্বর-নামক সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা করিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় হেতুর স্থান পূরণ করে। উমেশচন্দ্র অন্তত শেষ বয়সে সাংখ্যমত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এই শেষোক্ত ঈশ্বরবাদের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বৈদান্তিক "সোঽহং"-বাদটিই কিন্তু বিজ্ঞানদৃষ্টিতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

পঠদ্দশায় ইংরাজি শিক্ষার হাওয়ায় উমেশচন্দ্র পৌত্তলিকতার প্রতি ও হিন্দুর প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতির প্রতি আস্থা হারাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অনাস্থা কখনও তাঁহাকে শাস্ত্রবিরোধী আচারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল বোধ হয় না। তাঁহার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, এককালে ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসও তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মত অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। উপরেই বলিয়াছি, সাংখ্য-দর্শনোক্ত প্রকৃতি-পুরুষেরই সম্মিলনের অনির্দ্দেশ্য কারণের স্থলে তিনি ঈশ্বরকে স্থাপন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর অর্থে তাঁহার নিজ ভাষায় "An intelligent being to whose intelligent action the present form and arrangement of the world of matter and the connection between human souls and that world are

owing." এই ঈশ্বর কিন্তু অমঙ্গলের স্থষ্টিকর্ত্তা নহেন; তিনি অমঙ্গল হইতে মনুষ্যকে উদ্ধার করেন। এই অমঙ্গল আবার জগৎপ্রকৃতির অংশমাত্র। তাঁহার স্বভাষায় "Evil is a part of nature and the energy of God is directed to the purging of our nature from evil and to the raising of us to a higher state." এই মতের সহিত তাঁহার সাংখ্যমতের সামঞ্জস্য ঠিক বুঝা গেল না। অন্যান্য পণ্ডিতের ন্যায় তিনি বেদের বহুদেববাদের মধ্যে একেশ্বর-বাদের আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালের উপাস্য দেবতার তত্ত্বনির্ণয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত আছে। কোন্ মত সমীচীন, তাহা জানি না। অন্ততঃ জৈমিনিপ্রমুখ যে মীমাংসক-সম্প্রদায় বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিয়া বেদের প্রভুত্ব হিন্দুজাতির সমাজতন্ত্রের মূলে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং শ্রৌত ও স্মার্ত্ত আচারের ব্যবস্থাপনে যাঁহাদের নির্দ্দেশ সমস্ত হিন্দুসমাজ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহারা প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না, এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়।

দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসায় বিভিন্ন ব্যক্তি যে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সামাজিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আধুনিক হিন্দুর কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, এ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে কোনরূপ অস্পষ্টতা ছিল না। প্রথম বয়সে "পৌত্তলিকতা" সম্বন্ধে তাঁহার মত যাহাই থাক্, জীবনের শেষ ভাগে তিনি যন্ত্রযোগে উপাসনার সমর্থন করিতেন, এবং যন্ত্রযোগে উপাসন ও স্তুতিমাত্র বা ধ্যানমাত্র অবলম্বনে উপাসনার মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনামধ্যে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিলাম। সমাজধর্ম্ম-পালনে তিনি চাতুর্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সামাজিক ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন। কালভেদের

সঙ্গে ব্যবস্থাভেদের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অস্বীকার করিতেন না; এবং শত বৎসর পূর্ব্বে আচারবিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহার সকলগুলির উপযোগিতা না থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেও সম্ভবতঃ কুণ্ঠিত হইতেন না। ধর্ম্মশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথই যে সমাজভুক্ত ব্যক্তির অবলম্বনীয় পথ, এই স্থূল সিদ্ধান্তের সহিত ঐরূপ পরিবর্ত্তন-প্রিয়তার বস্তুতঃ কোন অসামঞ্জস্য নাই। ভগবান্ শাক্যমুনির সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল নূতন নূতন বেদবিরোধী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তৎপ্রতি কটাক্ষপাত করিতে, বোধ করি, এই জন্যই উমেশচন্দ্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চরিত সমালোচনাকালে উমেশচন্দ্র যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার আমি অনুমোদন করিতে পারিব না। কিন্তু যে ভাবপ্রবণ সমাজদ্রোহ ও কর্ম্মদ্রোহ শাস্ত্রসম্মত নিষ্কাম কর্ম্মপরতা হইতে আমাদের সমাজকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, উমেশচন্দ্র তৎপ্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত

(১)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। অদ্যকার সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা এই সাত বৎসরের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই জানেন, আমি পরিষদের অধিবেশনে আহূত হইয়া যদি কোন দিন একাকী সভামধ্যে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে চারিদিক্ হইতে আমার প্রতি প্রশ্ন হইত,—"রজনীবাবু কোথায়,—রজনীবাবু কোথায় ?" আজিকার অধিবেশনেও আমি আহূত হইয়া একাকী এই সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু আজি কেহই জিজ্ঞাসা করেন নাই,—রজনীবাবু কোথায় ? ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম। তদবধি পরিষৎ-সম্পর্কীয় সকল কার্য্যসম্পাদনেই আমি তাঁহার সহচর ছিলাম; যে দিন কোন কারণে তাঁহার সঙ্গ না পাইয়া আমাকে একা আসিতে হইত, সে দিন কোথায় যেন কিছু ফাঁক পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইত। ছয় বৎসর মাত্র অতীত হইতে না হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে সহসা তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশার্থ আমাকে আহ্বান করিবেন, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। Bengal Academy of Literature যখন বিজাতীয় নাম ও বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়, সেই দিন হইতেই রজনীবাবুর সহিত পরিষদের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। রজনীবাবুর সহিত পরিষদের কত নিকট সম্পর্ক ছিল, তাহা পরিষদের প্রাচীন সদস্যমাত্রই অবগত আছেন; পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুস্বরূপে তিনি সদস্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধার পাত্র' ছিলেন; বঙ্গ-সাহিত্যের অনুরক্ত ভৃত্যস্বরূপে

তিনি বঙ্গের সাহিত্যিক সমাজের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার অন্তরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল ; কলিকাতার মধ্যে তাঁহার ন্যায় আত্মীয় আমার দ্বিতীয় ছিল না ; এবং এই স্থানে আমি পরিষদের সদস্য ও পরিষদের প্রতিনিধি-স্বরূপে দণ্ডায়মান হইলেও আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরিহারপূর্ব্বক কোন কথা বলা নিতান্ত কঠিন। আমার উক্তির অধিকাংশই আমার ব্যক্তিগত কথা ; আশা করি, পরিষদের সভ্যগণ তজ্জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

আমার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, গ্রামের ছাত্রবৃত্তি-পাঠশালার নিম্ন শ্রেণীতে যখন আমি অধ্যয়ন করিতাম, তখন একদিন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে একখানি ক্ষুদ্রপুস্তিকা হইতে dictation দেওয়া হইতে-ছিল। কয়েক দিন পরে দেখিলাম, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আমাদের বাড়ীতে তক্তপোষের উপর পড়িয়া আছে। পুস্তিকাখানির নাম "জয়দেব-চরিত" ; গ্রন্থকারের নাম দেখিলাম, শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত। বইখানি পড়িবার চেষ্টা করিয়া ভাল বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু উহার বিজ্ঞাপনটা পড়িয়া মনের মধ্যে কিরূপ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহা আজ প্রায় ২৭।২৮ বৎসর পরে ঠিক আসিতেছে না।

এই ঘটনার ৫।৬ বৎসর পরে যখন আমি ইংরাজি স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা বহি, বাঙ্গালা কাগজ পড়া আমার রোগের মধ্যে ছিল। সেই সময়কার একখানা বান্ধব পত্রিকায় একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করি। সেই প্রবন্ধের শেষভাগে দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,—যাঁহার নামের সহিত পূর্ব্বেই আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল, সেই রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হইবে, এই চিন্তায় আমার বালকহৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল। একদিন সহসা দেখিলাম, সিপাহী যুদ্ধের

ইতিহাসের খণ্ডশঃ প্রকাশিত প্রথম ভাগ রজনীবাবুর অন্যতম বন্ধু বাঁকিপুরের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ-কর্ত্তৃক মদীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রেরিত হইয়াছে। আগ্রহসহকারে গ্রন্থের আদ্যন্ত পাঠ করিলাম; একবার পড়িয়া তৃপ্তি হইল না, পুনঃপুনঃ পাঠ করিলাম। গ্রন্থের ওজস্বিনী ভাষা ও বিষয়বর্ণনায় গ্রন্থকারের এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বে দেখি নাই। সত্যের প্রতি অনুরাগ,—স্বজাতির প্রতি অনুরাগ,—স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠে ব্যক্ত দেখিয়া আমার বালকহৃদয় পুলকিত হইল।

গ্রন্থ পাঠ করিয়া যেন গ্রন্থকারের চরিত্র চোখের উপরে দেখিতে পাইলাম; গ্রন্থপাঠে যে গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল না। কতবার আমার বাল্যবন্ধুগণকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস পড়িয়া শুনাইতাম; আমি স্বয়ং যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, সেই আনন্দভোগে অপরকে অধিকারী করিয়া আরও আনন্দ পাইতাম।

তাহার পর তিন চারি বৎসর অতীত হইল। আমি যেবার এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিই, রজনীবাবু সেবার এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া আমি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে কি-না, অনুসন্ধানে বাহির হই। আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকের আমি তাহার পূর্ব্বে অনুসন্ধান লই নাই। সে দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। কলেজ ষ্ট্রীট ৯৭নং বাড়ীর দোকানে বাহিরে ফুটপাতের উপর, সন্ধ্যার পর গুরুদাসবাবু মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল না। আমি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন আশাপ্রদ উত্তর পাইলাম না। তখন নিতান্ত নিরুৎসাহ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া বাসায় ফিরিলাম।

এই সময়ে চাঁপাতলা ফাষ্ট লেনের উপরে, বঙ্গবাসীর কার্য্যালয় ছিল। রজনীবাবু তাঁহার চাঁপাতলার বাসা হইতে মাঝে মাঝে চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন দিয়া বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে যাইতেন। ঐ লেনে আমার বাসা হইতে আমি রজনীবাবুকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাইতাম। বঙ্গবাসী কাগজে তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যাহা কিছু বাহির হইত, যত্নের সহিত তাহা পাঠ করিতাম। এই সকল প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া 'আর্য্যকীর্ত্তি' প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে শুনিবামাত্র একখানা কিনিয়া আনিয়া পাঠ করি। রাজপুত, শিখ ও মারাঠার কাহিনী রজনীবাবুর স্বাভাবিক ভাষায় বর্ণিত হইয়া মনের মধ্যে নানা ভাবের উদ্দীপনা করিত। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার পঠদ্দশার শেষ সময়ে রজনীবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ঘটে। অখিল মিস্ত্রির লেনে পরলোকগত গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরীর বাসায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া বাল্যাবধি আমি তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরিচয়ের পর তাঁহার চরিত্রসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, আমি ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই চরিত্রের সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও ঔদার্য্যে এই সভাস্থলের অনেকেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বাগ্‌বাহুল্যের কোন প্রয়োজন নাই।

রিপন কলেজে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া অবধি আমি রজনীবাবুর প্রতিবেশী ছিলাম। পরিচয় ক্রমশঃ বন্ধুতায় এবং বন্ধুতা ক্রমশঃ আত্মীয়তায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তাঁহার মধুর প্রকৃতির কোন অংশ আমার অজ্ঞাত ছিল না; তাঁহার সহিত অবস্থানই আমার বিদেশ-প্রবাসের সর্ব্বপ্রধান আনন্দ ছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাঁহার অন্তিম রোগের সঞ্চার হয়; অন্ততঃ তাঁহার মনের ভিতর ঐরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঐ রোগের বাহ্য লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় নাই; স্বাস্থ্যভঙ্গের কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই উড়াইয়া দিতাম। তিনিও

দুই-একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করেন নাই। এমন কি তাঁহার নিজ পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই এই আশঙ্কার কথা জানিতেন না। কিন্তু তদবধি তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করিতেন। গত শীতকালের অবসানে বাইসাইকেল অভ্যাসের চেষ্টা করিতেন। ক্বচিৎ বা শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া ওজন লইয়া আসিতেন।

এই সময়ে রজনীবাবু তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যসকল সম্পূর্ণ করিবার জন্য কিছু ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গৃহের লাইব্রেরিটির পূর্ণতা সাধনের জন্য তিনি অকাতরে পুস্তকসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; গত বৎসর পূজার পর গয়াধামে গিয়া পিতৃকৃত্য সমাধান করিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসখানি শেষ করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। তিনি কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে প্রায়ই বলিতেন, পরিবারবর্গের জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই কাশীবাসী হইব। বিগত ২রা বৈশাখ তারিখে তিনি পরিষদের অপর চারিজন সদস্যের সহিত পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ ভূমি প্রার্থনায় কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সমীপে যাত্রা করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার হাতে সামান্য একটি ব্রণ হইয়াছিল। আমার সহিত প্রায় প্রত্যহই তাঁহার দেখা হইত। কিন্তু সেই ব্রণের বিষয় আমিও জানিতাম না। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে, আরও কয়েকটা ব্রণ হয়; তৎপরে পৃষ্ঠে একটি ব্রণ দেখা দেয়। ২১শে বৈশাখ ও ৩১শে বৈশাখ তিনি সেই পৃষ্ঠব্রণের সংবাদ দিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে পত্র লেখেন। ৩২শে বৈশাখের পর আর তাঁহার পত্র পাই নাই। ঐ পত্রের দুই-চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—"উহা সাধারণ ফোড়া বলিয়া বোধ হয় না; ডাক্তার বলেন, carbun-

cular boil, কার্বঙ্কলের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে আমার বড় চিন্তার কারণ হইয়াছে। ঘা ভাল হইলে একবার বাড়ী যাইব; কারণ সর্ব্বাগ্রজ মহাশয় বাড়ীতে বড় পীড়িত অবস্থায় আছেন। ১০।১২ দিনের পর বাড়ী হইতে ফিরিব। তখন তোমাকে চিঠি লিখিব। শরীর ভাল থাকিলে তোমাদের ওখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিব।"

ইহার পর সিপাহী যুদ্ধের শেষ ভাগের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া তিনি বাটি গমন করেন এবং কার্বঙ্কলের পরিণত অবস্থা লইয়া ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না।

রজনীবাবু ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ী আসিবেন, আমি ও আমার বন্ধুগণ যে সময়ে ব্যগ্রভাবে এই প্রতীক্ষায় ছিলাম, সেই সময়ে সংবাদ আসিল, আমাদের সেই আশা আর পূর্ণ হইবার নহে। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় রজনীবাবু ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু আমাদের আশা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। সাহিত্যসমাজে রজনীবাবুর স্থান কোথায় তাহা নির্ণয়ের এ সময় নহে; বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার সম্পাদিত কার্য্যের সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। অন্যে সেই ভার গ্রহণ করিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার একান্ত অনুগত সুহৃৎকে হারাইয়াছে। পরিষদের জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, সেরূপ বোধহয় সে সময়ে অপর কেহ করেন নাই। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, শ্রদ্ধার সহিত ও অনুরাগের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম অনুরাগ পৃথিবীতে অতি বিরল সামগ্রী। পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই সেই শ্রদ্ধার ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছেন। আমি অনর্থক বাগ্‌বাহুল্য-দ্বারা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব না।

(২)

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মতুগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺ কমলাকান্ত দাসগুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ। রজনীকান্তের তিন ভ্রাতা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাসগুপ্ত মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া সম্প্রতি পেন্‌শন ভোগ করিতেছেন।

সাত-আট বৎসর বয়সে রজনীকান্তের কঠিন পীড়া হয় ও তাহার ফলে তাঁহার শ্রবণশক্তি চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল হইয়া যায়। এই দৌর্ব্বল্যের জন্য তাঁহার বিদ্যালয়ে অধিক দূর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ও উপাধিলাভাদি ঘটিয়া উঠে নাই।

বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কলেজে তিনি এণ্ট্রান্স্ ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয়-ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছু দিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন চাকরি গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বা চাকরি, কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায় তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতেই তাঁহার বাঙ্গালা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা-দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেবচরিত বাঙ্গালা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন

ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে প্রধানতঃ গোল্‌ডষ্টুকারের পাণিনি অবলম্বনে তিনি 'পাণিনি' পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের সাহিত্যচর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না, তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সেই সময় রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতি কষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সমাজে গণ্যমান্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের উপাধি লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন-বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা-দ্বারা জীবন অতিবাহনের সঙ্কল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক। রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চ্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এইরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে আমাদের মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেববাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর-পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই তিনি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করেন। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণীর মধ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। ঐ বৎসর

পরলোকগত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর বৎসর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃত গ্রন্থ এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া 'আর্য্যকীর্ত্তি' নাম ধারণ করে। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্‌ষ্ট বুক কমিটিকর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল; কোন কোনখানি ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপেও নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তকপ্রচারে তাঁহার যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য কষ্ট করিতে হয় নাই। অমায়িক ভদ্র স্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্পসময়ের জন্যও তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত; যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। তিনি প্রায় সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গসাহিত্যে রজনীকান্তের অভাব তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিতজনকর্তৃক পূর্ণ হইবে; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকাল-মরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন

Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীবাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনিই দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণকার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনীবাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্যপ্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎ-পত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া তিনি সর্ব্বদাই আলোচনা করিতেন। সাহিত্যপরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষাসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশদ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনাসমিতি-স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব তখন বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি.এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতে-

ছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য করিবার জন্ত পরিষৎ-কর্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। রজনীকান্ত কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদিগকেও শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন। রাজনীতি-বিষয়ে তিনি উদারমতাবলম্বী ছিলেন। কটন্ সাহেবের নিউ-ইণ্ডিয়া প্রচারিত হইবামাত্র তিনি ঐ গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গসমাজে প্রচার করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনি পথপ্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি, সেই পুরাতন আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি উহা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্ত রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়,—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল; এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহের জন্ত বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা-

বলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজকাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে স্বদেশের ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের অনুবর্ত্তীর আজকাল অভাব নাই; কিন্তু ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে সকলে সমর্থ নহেন। তাঁহার ভাষা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রবাহিত হইত; ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কি-না, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল; তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বতো-

ভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না; অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কি-না, জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্ত এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবল ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্যমধ্যে তাহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান যে কত উচ্চে, তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গলায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কি-না সন্দেহ।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছিলেন, এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের, অতএব বঙ্গমাতার, সেবা-ব্রতে সমগ্র জীবন উদ্যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি-না, জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকালমরণে দরিদ্র বঙ্গমাতা যে সন্তাপিত হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালক বলেন্দ্রনাথ যখন 'বালক' এবং 'ভারতী ও বালক' অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত বা তাঁহার রচনার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। 'সাধনা' বাহির হইলে, তাঁহার রচনা আমাকে আকৃষ্ট করে; তার পর হইতে তিনি যখন যাহা লিখিয়াছেন, প্রচুর আনন্দপ্রাপ্তির আশা লইয়া তাহাই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং কোনবারেই যে সেই আনন্দলাভে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা মনে হয় না। সেই আনন্দের উৎস এত শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে এবং বলেন্দ্রনাথের রচনা-সংগ্রহকে পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কখনও ভাবি নাই।

এই কার্য্যে কিন্তু আমার অধিকারও নাই,—যোগ্যতাও নাই; তৎসত্ত্বেও যখন তাঁহার স্বজনগণ আমাকে এই ভার দিলেন, অধিক বাক্যব্যয় না করিয়াই ভার লইলাম। কেন লইলাম, ঠিক বলা কঠিন। বোধ করি, বলেন্দ্রনাথের রচনার প্রতি আমার অনুরাগ-প্রকাশের এই অবসর আমি ত্যাগ করিতে চাহি নাই।

বলেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গীই আমাকে এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল; এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তার পূর্ব্বে আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি, বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল। শিক্ষানবিশি অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনি অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না; কিন্তু শব্দগুলিকে বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া, কোথায় কোন্‌টি বসাইলে ভাল মানাইবে, তাহা

স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া, তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিকরের হাতের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি অপেক্ষা সৌষ্ঠবের শ্রীছাঁদ দিবার চেষ্টা করিতেন; তাহার জন্য যে সুরুচির,—যে সামঞ্জস্য-বুদ্ধির,—যে সংযমের প্রয়োজন ছিল, তাহা প্রচুরপরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষার প্রতি এইরূপ যত্ন অতি দুর্লভ। অধিকাংশ লেখক ভাষাকে কেবল ভাবপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র দেখেন,—উহাকে কারুশিল্পের হিসাবে দেখেন না। কবিতারচনায় ছন্দের আবশ্যকতা আছে; বলেন্দ্রের গদ্যরচনাতেও সেই ছন্দের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়; এই ছন্দ ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অপরূপ কলাকৌশলের উৎপত্তি করিয়াছে। বলেন্দ্রের ভাষায় যে স্নিগ্ধ-কোমল প্রশান্ত উজ্জ্বলতা আছে, তাহা চোখ ঝল্‌সাইয়া দেয় না, কেবলই তৃপ্তি উৎপাদন করে। সেই তৃপ্তি কিন্তু কখনও মাত্রা ছাড়াইয়া পরিতৃপ্তিতে দাঁড়ায় না। স্রোতস্বতীর মত ইহা স্থির গতিতে আপন নির্দ্দিষ্ট পথে চলে; ইহার পূর্ণতা কখনও উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া কূল ভাসাইয়া জলপ্লাবন ঘটায় না। ইহার মধ্যে কোথাও ফেনিল আবর্ত্ত নাই; কোথাও ইহা জলপ্রপাতের কোলাহল উপস্থিত করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁহাদের বশংবদ ভৃত্য; তাঁহারা উহাকে যখন যে কাজে বিনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আদেশে ইঙ্গিতমাত্রে ভাষা তদনুযায়ী পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র বা ঐশ্বর্য্য লইয়া তখনই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ভাষায় যে বল আছে,—যে বেগ আছে,—যে তীব্রতা আছে,—যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নমুখতা আছে, এবং প্রয়োজনমত ঐশ্বর্য্য আছে, বলেন্দ্রের ভাষায় সে সকল না থাকিতে পারে; কিন্তু ইহার স্থিরতা, দৃঢ়তা ও স্বচ্ছপ্রাঞ্জলতা আর সরসকোমলতা তাঁহার রচনাকে কাব্যের সীমামধ্যে রাখিয়া দিয়াছে।

লেখকের ভাবুকতা ও লিপিকৌশল উভয়ের মূলস্থ শক্তি সামঞ্জস্য-বোধ ও সংযম। এই দুইটি না থাকিলে সুরুচি থাকে না। বলেন্দ্রের আলোচ্য বিষয় অনেক ছিল ; কাব্য ও কলাবিদ্যা, মানবসমাজ ও মানবজীবন, এইরূপ নানাবিধ বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এই বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে কোথায় কি দেখিবার, বুঝিবার, আস্বাদনের ও উপভোগের আছে, তাহা তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছে ও দেখাইতে হইয়াছে। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্তটা দেখিয়াছেন,—ফুলের ভিতর হইতে মধু আহরণ করিতে গিয়া বাহির হইতে ফুলের শোভাটা দেখিয়া লইতে ভুলেন নাই ; কোন একটা অবয়বের অস্বাভাবিক স্ফীতি বা হীনতা বা অযথা সন্নিবেশ যেখানে তাঁহার সামঞ্জস্যবুদ্ধিকে আহত করিয়াছে, সেখানে মৃদু হাস্য ও শ্লেষের দ্বারা সেই ত্রুটি দেখাইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তৎকর্তৃক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনায় ইহার ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু বিশ্লেষণ দ্বারা কেবল দোষদর্শন ও হীনতার আবিষ্কার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সৌন্দর্য্যের আবিষ্কারই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। যে সৌন্দর্য্য অন্যের চোখে প্রকাশ পাইত না, তিনি তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ প্রসঙ্গ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

বৈজ্ঞানিকের সহিত সাহিত্যিকের একটি স্থানে মিল আছে। ইতর সাধারণ সকলেই সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সেই কয়টা জিনিষকে জীবনের কাজে লাগাইয়া, যেন-তেন-প্রকারেণ তাড়াতাড়ি জীবনযাত্রায় দৌড়িয়া চলিতেছে ; আশেপাশে যাহা আছে, তাহার প্রতি মনঃসংযোগের অবকাশ পাইতেছে না। কিন্তু কয়েকজন লোক এই আশেপাশে চাহিয়া অন্যে যাহা দেখে না, তাহাই দেখেন এবং ইতর-সাধারণকে যখন দেখান, তখন তাহারা নূতন

কি দেখিলাম বলিয়া চমকিয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক বলেন—'দেখ, এত বাস্তবিক সত্য, তা তুমি এতদিন দেখ নাই; ইহা হইতে জীবনের কত প্রয়োজনসিদ্ধি, জীবনযুদ্ধে কত সাহায্য ঘটিতে পারে।' সাহিত্যিক বলেন,—'দেখ, এত সুন্দর দৃশ্যের প্রতি তুমি এতকাল তাকাও নাই, ইহা হইতে কত আনন্দ মিলিতে পারে, জীবনযুদ্ধের আনুষঙ্গিক দুঃখ কত কমাইতে পারা যায়।' একজন যেখানে সত্যের, অন্যজন সেখানে সুন্দরের আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের দৃষ্টি একই দিকে; আবার উভয়েই যখন সেই সত্যকে—সুন্দরকে, শিবরূপে প্রতিপন্ন করেন, তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েই তত্ত্ববিদ্যার পরম প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়।

এই আবিষ্কারের জন্য যে যোগ চাই, তাহা সকলের নাই; কিন্তু একদেশদর্শিতা, দৃষ্টিভ্রম ও দৃষ্টিবিকার এখানেও সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ের কর্ত্তব্যসাধনের প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিতে হইলে, সাধনা আবশ্যক ও সংযম আবশ্যক; নহিলে উভয়েরই কর্ম্মে প্রমাদ ঘটে। সমালোচকের পথ যে বৈজ্ঞানিক পথ হইতে বহুদূরে বা ভিন্ন মুখে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বলেন্দ্রনাথের এই সংযম যে প্রচুরপরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার ভাষাতেও যেমন বুঝা যায়, তাঁহার ভাবগ্রাহিতাতেও তেমনই বুঝা যায়। তিনি ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতেন ও ভাবের বায়ুভরে উড়িয়া বেড়াইতেন; অথচ আপনাকে একান্ত পরবশ করিয়া, মেরুদণ্ডহীনের মত ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া, আপনাকে শোচনীয় ও কৃপাপাত্র করিয়া তুলেন নাই। এ বিষয়ে তিনি আধুনিক বাঙ্গলায় বহু সাহিত্যসেবীর ও বহুতর সাহিত্যজীবীর অনুকরণীয় আদর্শস্থল বা শিক্ষাস্থল।

বাঙ্গালা দেশের আধুনিক সাহিত্যের দূষিত হাওয়ায় থাকিয়াও

তিনি অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার সংক্রামক ব্যাধি হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন ; ইহাতে তাঁহার সংযম ও নিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন স্বাস্থ্যের ও বলবত্তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আপনার উপর তাঁহার প্রভুত্ব ছিল ; ভাবের বিকারে তিনি আত্মহারা হইয়া যান নাই।

বয়সের সহিত তাঁহার যেমন চিন্তার গাঢ়তা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তেমনি অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতাও বিকাশ পাইতেছিল ; বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার শেষদিকের রচনা হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বালকের চাঞ্চল্য, বালকের রচনাতেও অধিক ছিল না ; কিন্তু বিদেশী শিক্ষার মোহ হইতেও এই অল্পশিক্ষিত বালক অনেক অতিশিক্ষিত বৃদ্ধ অপেক্ষা মুক্ত ছিলেন। 'সাধনা' পত্রে প্রকাশিত 'বারাণসী' 'কণারক' 'খণ্ডগিরি' ও 'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বদেশী সৌন্দর্য্যে অনুরাগ ও প্রীতি আমাকে বলেন্দ্রনাথের যে পরিণতি দেখিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, অনতিবিলম্বে প্রকাশিত 'প্রাচ্য-প্রসাধন-কলা' ও 'নিমন্ত্রণ-সভা' সেই পরিণতির দ্রুতত্বে যে আমাকে চমকাইয়া দেয় নাই, তাহা বলিতে পারিব না। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটির মধ্যে আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরের 'শ্রীহস্ত' ও 'শুভদৃষ্টি', গৃহিণীর 'লক্ষ্মীশ্রী' ও 'কল্যাণীমূর্ত্তি', আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের মূলে 'শুভসঙ্কল্প' প্রভৃতি কয়েকটি নূতন কথা পাইলাম, যাহা ইতঃপূর্ব্বে আর কোন শিক্ষিত স্বদেশীর মুখে এমনভাবে শুনি নাই। জোড়াসাঁকোর যে বৃহৎ অট্টালিকার দিকে নব্যতন্ত্রের বাঙ্গালী সমাজ এতদিন ধরিয়া সময়োচিত নূতন ভাবের ও নূতন তন্ত্রের, এমন কি নূতন ফ্যাশনের জন্য উন্মুখ হইয়া চাহিয়াছিল,—মনের কথা গোপন নাই-বা করিলাম,—সেখান হইতে যে এমন কথাগুলি বাহির হইবে, তাহার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে

করে নাই; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত সকলকে আপন ঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খঘোষও তখন পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে, বাঙ্গালীর গৃহস্থলীতে, সামাজিক প্রথায় ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে,—যাহা শিব আছে,—তাহা সহসা সম্মুখে আনিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বলেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের যে বিশিষ্টতা ছিল, সেই বিশিষ্টতার গঠনকর্ম্মে, তাঁহার পিতৃব্যের কতটুকু কৃতিত্ব ছিল, আমরা বাহির হইতে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। তবে রবিরশ্মির প্রভাব হইতে আপনাকে আচ্ছন্ন রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। অথবা বাঙ্গলার সাহিত্য-জগতের বহু গ্রহ, উপগ্রহ ও বহুতর উল্কাপিণ্ড যাঁহার নিকট হইতে স্থায়ী বা ক্ষণিক প্রভা সংগ্রহ করিয়া দীপ্তি লাভ করিতেছে, বলেন্দ্রের মত অনুগামী ও অনুচরে তাঁহার জ্যোতির আংশিক প্রতিফলনে ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু নাই। বরং এত সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তিনি যে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার সামর্থ্যের বিশিষ্টতা। গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনায় তাঁহার এই নিজস্ব শক্তির স্পষ্টতর পরিচয় মিলে। তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মূল্য তাঁহার গদ্য রচনার সমান না হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে তাঁহার নৈসর্গিক শক্তির ও স্বাতন্ত্র্যের অধিক স্ফূর্ত্তি আছে। অন্ততঃ আধুনিক বঙ্গের অধিকাংশ কবির মত তিনি রবি-প্রতিভায় অভিভূত হন নাই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, সেই সাহিত্যের প্রভাবে তিনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া তিনি আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বলেন্দ্রনাথের জীবনের স্বল্পকাহিনী লিপিবদ্ধ করা আমার কাজ নহে।

তাঁহাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনিবার সুবিধা বা অবকাশ আমার ঘটে নাই। কয়টা দিনের জন্য আমি তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছিলাম। তাঁহাকে মিতভাষী ও মিষ্টভাষী দেখিলাম। তাঁহার রচনায় যে কোমল, স্নিগ্ধ, প্রশান্ত শ্রী ছিল, তাঁহার মুখে চোখে ও কথাবার্ত্তায় তাহা আরও স্পষ্ট দেখা যাইত। এখানে যেন তাহা সমস্ত তারল্য ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া আরও ঘনাইয়া আসিয়াছিল। বালকের মূর্ত্তির ভিতর প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাইতাম; তাঁহার পরিমিত স্বল্পাক্ষরবদ্ধ উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর যেন একটা নির্লিপ্ততার ভাব দেখিলাম। তিনি যেন পর্য্যবেক্ষক মাত্র; সংসারের চক্রে তাঁহাকে যেন কেহ বাঁধিয়া দিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র; উহাতে আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন না। উহার উন্মত্ত কোলাহলে যোগ দিতে তিনি যেন অক্ষম। সংসারের বিচিত্র সৌন্দর্য্যকলার উপভোগের জন্য হয়ত তিনি উপস্থিত আছেন, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যকে দৃঢ় স্পর্শে আঁকড়াইয়া ধরিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই।

তাঁহার গদ্য রচনায় তিনি নিজের উপর যতটা কর্তৃত্ব রাখিয়াছিলেন, কবিতাগুলিতে তাহার কিছু অভাব দেখা যায়। ইহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে, বিশেষতঃ মানসিক সৌন্দর্য্যের দিকে একটা ভাবপ্রবণ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। উহাকে সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মাত্র বলিব, তৃষ্ণা বা লালসা বলিব না। কিন্তু তাঁহার যেন তৃপ্তির পর্য্যবসান হইতেছে না। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই যেন থাকিয়া গেল; যেন মধ্যপথ হইতে সহসা কোন অদৃশ্য হস্ত আসিয়া তাঁহাকে নিঃশব্দে সরাইয়া লইয়া গেল।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-কৃত

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের নাম
কর্ম্মকথা	প্রকৃতি
জিজ্ঞাসা	নানা কথা
যজ্ঞকথা	বিচিত্র জগৎ
শব্দকথা	

৺ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

জাতক—অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের আখ্যায়িকাবলী

(মূল পালি হইতে অনূদিত)

১ম খণ্ড—(১-১৫০ আখ্যায়িকা)

২য় খণ্ড—(১৫১-৩০০ আখ্যায়িকা)

৩য় খণ্ড—(৩০১-৪৩৮ আখ্যায়িকা)

৪র্থ খণ্ড—(৪৩৯-৫০৯ আখ্যায়িকা)

৫ম খণ্ড—(৫১০-৫৩৭ আখ্যায়িকা)

৬ষ্ঠ খণ্ড—(৫৩৮-৫৪৭ আখ্যায়িকা)

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের পুস্তকাবলী এবং ৺ঈশানচন্দ্র ঘোষ প্রণীত সমুদয় পুস্তকাবলী ক্রমশঃ ছাপা হইতেছে। উহা দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড হইতে পাওয়া যাইবে।

প্রকাশক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি.এল.
'অনুকূল-ভবন'
১৬১।২।১, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-১৯।

